



এডওয়ার্ড
কলেজ নিয়ে
স্মৃতিকথা

৪ ❖ পৃষ্ঠা

sompri.pabna@gmail.com

সম্প্রীতি

বাংলাদেশ

যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ



সম্প্রীতি বাংলাদেশ
প্রতি মাসের
১৪ তারিখ
প্রকাশিত হয়



www.sompribangladesh.com

‘অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে।/নির্মল করো উজ্জ্বল করো, /সুন্দর করো হে।/জাখত করো, উদাত করো, /নির্ভয় করো হে।/মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে।/অন্তর মম বিকশিত করো, /অন্তরতর হে।/যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, /মুক্ত করো হে বন্ধ, /সঞ্চার করো সকল কর্মে/শান্ত তোমার হৃদ।/চরণপদ্মে মম চিত্ত নিঃস্পন্দিত করো হে, /নন্দিত করো, নন্দিত করো, /নন্দিত করো হে।/অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে।’

তৃতীয় বর্ষ • সংখ্যা ১০ • ৩০ ভাদ্র ১৪৩৩ • ঢাকা সোমবার • ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ • ১ রবিউস সানি ১৪৪৮ হিজরি • পৃষ্ঠা ৮ • ১০ টাকা

কবে মিলবে রূপপুরের বিদ্যুৎ

নভেম্বরকে সামনে রেখে আশাবাদ

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

উৎপাদন শুরু সময় বারবার পিছিয়ে যাওয়ায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে কবে নাগাদ বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে- তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য বলছে, কেন্দ্রটি চালুর আগে বর্তমানে প্রেসারাইজার পাইলট অপারেটেড রিলেটেড ভালব (পিওআরভি)-এর ত্রুটি সারানোর কাজ চলছে। এরপর

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

মাথা ছাড়াই বিদ্যাশিক্ষা

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

স্কুলের প্রধান শিক্ষককে মাথা মনে করা হলে, সেই মাথা ছাড়াই ৫৪ শতাংশ স্কুলে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। এ চিত্র অনেক জায়গার মত পাবনাতেও। জেলার নয়টি উপজেলায় মোট ১ হাজার ১৩৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ৫২২টিতে প্রধান শিক্ষক থাকলেও বাকি ৬১৪টি বিদ্যালয়েই চলছে ভারপ্রাপ্ত দিয়ে। অর্থাৎ ৫৪ শতাংশ প্রাথমিকেই কোনো স্থায়ী প্রধান শিক্ষক নেই। উপজেলাভিত্তিক তথ্য বলছে, সাঁথিয়ায় ১৭৮টির মধ্যে ৯৪টি, সুজানগরে ১৪৫টির মধ্যে ৯৩টি, চাটমোহরে ১৫৫টির মধ্যে ৯০টি, বেড়াই ১১২টির মধ্যে ৭৪টি, পাবনা সদরে ১৮৫টির মধ্যে ৭১টি, ভানুয়ায় ৯৯টির মধ্যে ৫৪টি, ঈশ্বরদীতে ১০০টির মধ্যে ৪৯টি, ফরিদপুরে ৮৪টির মধ্যে ৪৮টি ও আটঘরিয়া উপজেলায় ৭৮টির মধ্যে ৪১টি প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। পাবনা সদরের দাশপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক

এরপর পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২



প্রধান শিক্ষক ছাড়াই
৫৪ শতাংশ
প্রাথমিক বিদ্যালয়

২৪ লাখের পোয়াবারো!

আমজনতায় ‘খাঁড়ার ঘা’

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

সরকারি সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ১০০-১৪২ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়েছে। অর্থাৎ ১৮ কোটি মানুষের মধ্যে সরকারি সুবিধার আওতায় চাকরিজীবীর সংখ্যা ২৪ লাখ (বেসামরিক ও সামরিক)। এঁরা ঘোষিত পে-স্কেল অনুযায়ী এই সুবিধা পাবেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

কূপের জন্য তৈরি হচ্ছে ৬ একর জমি

২০ বছরের গ্যাস মোবারকপুরে

■ আহমেদ হুমায়ুন কবির তপু

পদ্মা ও যমুনা নদীর কাছে মোবারকপুর থেকে প্রতিদিন ২০ মিলিয়ন ঘনফুট জ্বালানি গ্যাস পাওয়ার আশা করা হচ্ছে। এই স্থানে পুরো ২০ বছর ধরে উত্তোলন করার মত গ্যাস মজুত রয়েছে বলে ধারণা। এ গ্যাস উত্তোলনের জন্য শুরু হয়েছে যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টা। গ্যাস কূপের জন্য ৬ একর জায়গা নির্ধারণ করে চলছে সাইট প্রস্তুত ও পাইলিংয়ের কাজ।

মোবারকপুরের অবস্থান যমুনা নদীর কাজিরহাট ফেরিঘাট থেকে ১২-১৫ কিলোমিটার পশ্চিমে। রাজধানী ঢাকা থেকে পাটুরিয়া

ফেরিঘাট দিয়ে যমুনা পার হয়ে কাজিরহাট ঘাট দিয়ে সিএনজি, অটোরিকশা বা বাসে করে সুজানগর উপজেলার আহম্মদপুর ইউনিয়নে মোবারকপুরে পৌঁছানো যায়। আর পাবনা থেকে সুজানগর-বনকোলা-আহম্মদপুর বাজার হয়ে পৌঁছার পথ। সরাসরি কাজিরহাটগামী বাস, সিএনজি বা লেগুনায় যাওয়া যায়। পদ্মা নদী থেকে উত্তর দিকে অবস্থিত এই স্থানের দূরত্ব ৫ থেকে ৮ কিলোমিটার।

প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, গত ২৭ জুলাই থেকে মোবারকপুর সাইটের পাইলিং কাজ শুরু হয়েছে। ৫.৫ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ এই

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

সম্প্রীতি বাংলাদেশ এখন সারা বিশ্বে

নতুন বর্ষপূর্তিকে সামনে রেখে সম্প্রীতি বাংলাদেশ অগ্রযাত্রার নতুন ধাপে পা দিয়েছে। এখন বিশ্বের সব দেশের সব জায়গা থেকে ওয়েব প্ল্যাটফর্মে পড়া যাবে সম্প্রীতি বাংলাদেশ।

পাঠক, গ্রাহক, লেখক এবং শুভানুধ্যায়ীরা এই প্ল্যাটফর্মে শুধু সম্প্রীতি বাংলাদেশ পড়তেই পারবেন না- মতামত দিতে পারবেন, লিখতে পারবেন। বিজ্ঞাপনদাতারাও এই বিশালত্বকে কাজে লাগাতে পারবেন।

সম্মানিত
পাঠক, গ্রাহক, লেখক ও শুভানুধ্যায়ী- আমরা সকলের অংশগ্রহণ এবং সম্প্রীতি চাই। এগিয়ে যাওয়ার পক্ষে চাই সহযোগিতা।

-প্রকাশক

আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকার
ওয়ের প্ল্যাটফর্ম লিংক :
<http://sompribangladesh.com>

প্ল্যাটফর্মের ই-মেইল :
sompri.bd@gmail.com



পাবনাকে যুক্ত করেই ওয়াই সেতু

শিমুল বিশ্বাস এমপি

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

পাবনাবাসীকে সুখবর দিয়ে পাবনা-৫ আসনের সংসদ সদস্য ও প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা এডভোকেট শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস এমপি বলেছেন, আমি আগাম সুখবর দিতে পারি যে ওয়াই সিস্টেম ব্রিজ পাবনাকে কান্টো (সংযুক্ত) করে হতে যাচ্ছে। এখন শুধু আমাদের জাতীয় একত্ব দরকার।

এরপর পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

একদিকে লোডশেডিং আরেকদিকে ভুতুড়ে বিল

বিদ্যুৎ সেবায় নাভিশ্বাস

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

দ্বিমুখি বিপদে বিদ্যুৎ গ্রাহকরা। একদিকে তারা প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ পাচ্ছেন না, আরেকদিকে তাদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে অস্বাভাবিক বা ভৌতিক বিল। দুই থেকে তিন মাস ধরে চলছে এ অবস্থা। এতে করে গ্রাহকদের মধ্যে নাভিশ্বাস পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এরই জের ধরে দেশের অনেক স্থানের বিদ্যুৎ অফিসে হামলা-ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে চলেছে। গ্রাহকদের প্রধান অভিযোগ, এমনিতেই বিদ্যুৎ মিলছে একেবারেই কম। ঘন ঘন লোডশেডিংয়ের জ্বালায় অতিষ্ঠ হতে হচ্ছে। কল-কারখানা, দোকান-পাট, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান অচল হয়ে পড়ছে। সাধারণ মানুষ বাড়ি-ঘরে পর্যন্ত

প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ পাচ্ছেন না। তার উপর বিদ্যুতের বিল আসছে অস্বাভাবিক। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, যেখানে তিন মাস আগেও মাসে বিল আসতো এক হাজার টাকার নিচে, সেখানে এখন আসছে চার থেকে পাঁচ হাজার টাকার মত। বিদ্যুৎ নাই, ব্যবহার নাই- অথচ ভুতুড়ে বিল ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে প্রিপেইড বা স্মার্ট মিটার কয়েক ধাপ এগিয়ে গলা কাটছে।

সার্বিক বিষয়ে খোঁজ নিয়ে ধারণা পাওয়া গেছে, তীব্র লোডশেডিংয়ের মধ্যেও স্বাভাবিকের চেয়ে ৩ থেকে ৪ গুণ বেশি বা ভৌতিক বিল আসার পেছনে রয়েছে বেশ কতগুলো কারণ। যেমন মাঠপর্যায়ে মিটার রিডাররা

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১



মাটি ও মানুষের সংগ্রামে
সম্প্রীতি কে শুভেচ্ছা



DCH TRUST
Dhaka Community Hospital Trust

DHAKA COMMUNITY HOSPITAL TRUST
190/1 BORO MOGHBAZAR, WIRELESS RAIL GATE, DHAKA-1217



সোমবার
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬



‘অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে।/ নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে।/ জাহ্নত করো, উদ্ভাত করো, / নির্ভয় করো হে।/ মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে।/ অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে।/ যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / যুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্ম/ শান্ত তোমার ছন্দ।/ চরণপাশে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে।/ অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।’



নজরুল সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সারাদেশের মত পাবনায়ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক নজরুল বিষয়ক জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়েছে গত ৩১ আগস্ট। পাবনা জেলা প্রশাসনের আয়োজনে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব রাবেয়া বসরী, পুলিশ সুপার আবু আশ্রাফ, পাবনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আখতারুজ্জামান আখতারসহ জেলা

প্রশাসন, সংস্কৃতি অঙ্গন ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। অনুষ্ঠানে আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্য, সংগীত ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান পুরুষ। তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনা, সাম্য, মানবতা ও দেশপ্রেমের আদর্শ নতুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে এ ধরনের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নজরুলের সাহিত্য ও সৃষ্টিকর্মের সঙ্গে পরিচিত করার পাশাপাশি তাদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশেও এ আয়োজন সহায়ক হবে। আলোচনা সভা শেষে অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

নেপালে মানবিক তৎপরতা চালাচ্ছে ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল ট্রাস্ট

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

নেপালে সাম্প্রতিক ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বন্যা-পরবর্তী মানবিক সংকটে বাংলাদেশের ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল ট্রাস্ট (ডিসিএইচ ট্রাস্ট) তাদের দক্ষ মেডিকেল টিম নিয়ে দুর্যটনাস্থল ও প্রত্যন্ত এলাকায় জরুরি মানবিক ও চিকিৎসা সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিকভাবে অভিজ্ঞ এই দল দুর্যোগে আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছে। ট্রাস্টে কর্মতৎপরতার মধ্যে প্রধানত রয়েছে জরুরি প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান, বন্যা ও ভূমিধসের কারণে দুর্যটনাস্থলে আহত ব্যক্তিদের তাৎক্ষণিক জরুরি চিকিৎসা ও ওষুধ সরবরাহ, যেসব দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় মূল উদ্ধারকারী দল বা সরকারি চিকিৎসাসেবা পৌঁছাতে দেরি হচ্ছে- সেখানে এই দল থেকে মোবাইল ক্যাম্পের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান, দুর্যোগ পরবর্তী বন্যা উপদ্রুত এলাকায় পানিবাহিত এবং সংক্রামক রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও সচেতনতা তৈরি করা। ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল ট্রাস্টের চেয়ারম্যান লন্ডন থেকে সম্প্রীতি বাংলাদেশ-এর সম্পাদকমন্ডলির সভাপতিকে জানিয়েছেন, ২০২৬ সালের ২৬ আগস্ট হিমবাহ ধসে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসের ফলে নেপালের নুয়াকোট জেলার দেবীঘাট মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ডিসিএইচ ট্রাস্টের টিম সেখানেই প্রথম দফায় সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করে। ট্রাস্টের ওয়েব সাইটে বলা হয়েছে, সংস্থাটির



নেপালের নুয়াকোট জেলার দেবীঘাট এলাকায় কর্মরত ডিসিএইচ ট্রাস্টের একজন কর্মী

বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে (যেমন ২০০৫ সালে পাকিস্তানের ভূমিকম্প এবং ২০১৫ সালে নেপালের প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কাজ করার দীর্ঘ পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে। এই অভিজ্ঞ টিম বর্তমান বন্যা ও ভূমিধস পরিস্থিতিতে নেপালের স্থানীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর চাপ কমাতে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

বিদ্যুৎ সেবায় নাতিশ্রাস

প্রথম পৃষ্ঠার পর : বসে আদ্যজ্ঞ বা অনুমাননির্ভর রিডিং লিখে বিল তৈরি করছেন, অতিরিক্ত বা ভুল ইউনিট এক মাসের বিলে যোগ করার কারণে গ্রাহকের ট্যারিফ বা বিলিং রেটের সর্বোচ্চ ধাপ (ড্র্যাগ) স্পর্শ করছে, ফলে বিলের পরিমাণ আকাশচুম্বী হচ্ছে, প্রিপেইড মিটারে টাকা রিচার্জ করলেই মিটার ভাড়া, ডিম্যান্ড চার্জ এবং ভ্যাট বাদ বড় অঙ্কের টাকা কেটে নেওয়া হচ্ছে। সাধারণ গ্রাহকদের অভিযোগ, নতুন ডিজিটাল বা প্রিপেইড মিটারগুলো অত্যন্ত নিম্নমানের এবং এগুলো বসানোর পর আগের চেয়ে দ্বিগুণ দ্রুততায় ইউনিট কাটছে। এ অবস্থায় গ্রাহকদের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও অনেক জায়গায় পুলিশ ভয় বা বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার হুমকি দিয়ে এইসব মিটার চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অভিযোগ অনুযায়ী, জাতীয় গ্রিড থেকে গ্রামাঞ্চলে (পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আওতায়) চাহিদার তুলনায় বরাদ্দ অনেক কম, ফলে শহর এলাকার তুলনায় গ্রামে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোডশেডিং বজায় রাখা হচ্ছে। প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, অতিরিক্ত গরমে দীর্ঘস্থায়ী লোডশেডিং এবং সেইসঙ্গে অযৌক্তিক বিদ্যুৎ বিলের বোঝায় মফস্বল ও গ্রামীণ জনজীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। এইসঙ্গে কর্মকর্তাদের উদাসীনতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়হীনতা অভিযোগ আমলে না নেওয়া, অস্বাভাবিক বিলের বিরুদ্ধে স্থানীয় বিদ্যুৎ অফিসে (যেমন: পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বা নেসকো) অভিযোগ করতে গেলে কর্মকর্তারা তা সংশোধন না করে গ্রাহকদের উল্টো হেনস্তা করছেন কিংবা আগে বিল পরিশোধ করতে বাধ্য করছেন। অভিযোগ অনুযায়ী, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এবং পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্মকর্তাদের ভেতরে দীর্ঘদিনের প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতা ও সমন্বয়হীনতা গ্রাহক সেবাকে আরও ভঙ্গুর করে তুলেছে। ফলে ভোগান্তি ও আর্থিক জুলুমের প্রতিবাদেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের উপকেন্দ্র ও কার্যালয়গুলোতে গ্রাহকদের হামলা, ঘেরাও এবং গণবিক্ষোভের মতো ঘটনা ঘটছে।

আমজনতায় ‘খাঁড়ার ঘা’

প্রথম পৃষ্ঠার পর : আমজনতার ভাণ্ডে ‘যোগফল’ যুক্ত হওয়া তো দূরে থাক- তাঁদের উল্টো পরিস্থিতির মুখে পড়তে হচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্য বলছে, চাকরিজীবীদের বেতন ১০০-১৪২ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর ফলে সরকারের অতিরিক্ত বার্ষিক ব্যয় হবে ১ লাখ ৫ হাজার ৫৮০ কোটি টাকা। অথচ চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে পে-স্কেল বাস্তবায়নের জন্য রাখা হয়েছে প্রায় ৪৪ হাজার কোটি টাকা। প্রশ্ন হলো, বাকি টাকা আসবে কোথা থেকে? অন্যদিকে চলতি অর্থবছরের বাজেটের ঘাটতিই ২ লাখ ৪৩ হাজার কোটি টাকা। ফলে পূর্ণ পে-স্কেলের অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ বর্তমান বাজেট ঘাটতির প্রায় ৪৩ শতাংশের সমান। এমনটিতেই নিত্যপণ্যের অগ্রিমূল্যে পুড়ছেন সাধারণ মানুষ। এরইমধ্যে কয়েক দফা বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের দাম বাড়িয়ে তাঁদের আরও বেসামাল অবস্থায় ফেলা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা এবং ক্ষোভ। তথ্যানুযায়ী, সরকার যদিও একবারে পুরো পে-স্কেল বাস্তবায়ন করছে না। মূল বেতন ২০২৬ সালের ১ জুলাই থেকে ২০২৭ সালের ১ জুলাইয়ের মধ্যে তিন ধাপে কার্যকর হবে। বিভিন্ন ভাতা একযোগে কার্যকর হবে ২০২৮ সালের ১ জানুয়ারি থেকে। ফলে সরকারের ওপর একসঙ্গে বড় ধরনের চাপ পড়বে না। অবশ্য অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের ভাষ্য, বেতন ও ভাতার বাড়তি ব্যয় একবার শুরু হলে তা আর এককালীন থাকবে না। প্রতি বছরই সরকারের স্থায়ী ব্যয় বাড়বে। এর সঙ্গে ভবিষ্যৎ ইনক্রিমেন্ট, পেনশন ও অন্যান্য সুবিধার ব্যয়ও বাড়বে। এখানেই রাজস্ব আদায় গুরুত্বপূর্ণ। রাজস্ব আয় না বাড়লে সরকারকে উন্নয়ন ও অন্যান্য ব্যয় কমাতে হবে, নয়তো খণের ওপর নির্ভরতা বাড়তে হবে। অর্থনীতিবিদদের মতে, রাষ্ট্রের আয় বাড়ানোর সক্ষমতা না বাড়িয়ে নিয়মিত ব্যয় মেটাতে ঋণ নেওয়া হলে দীর্ঘমেয়াদে আর্থিক চাপ বাড়বে। দেশের সাড়ে ১৪ লাখের (বেসামরিক) বেশি সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারির বেতন বাড়লে শুধু মূল্যস্ফীতিই নয়- বৈষম্য, দারিদ্র্য ও তারল্য সংকটসহ আর্থ-সামাজিক নানাক্ষেত্রে সীমাহীন ঝুঁকি বাড়তে পারে। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য এই বাস্তবতা ‘মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা’ হয়ে এসেছে। তবে সরকার কীভাবে এই পরিস্থিতি সামাল দেবে, বা দিতে পারবে কিনা- সেটাই এখন দেখার বিষয়।

ট্রেন সার্ভিস ও বিমান

শেষের পৃষ্ঠার পর : আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর ঈশ্বরদী বিমান বন্দর চালুকরণের বিষয়টিও অপেক্ষার তালিকায় রয়েছে। যদিও এখন পর্যন্ত বিমান বন্দরটি সাজানো গোছানো বা উপযুক্তকরণের কাজ করার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় থেকে বিমানবন্দরটি সংস্কার ও পুনরায় চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

ফুলের অভাব চলনবিলে

শেষের পৃষ্ঠার পর : পানির প্রবাহ খুব কম। তাই ফুল ও ফুটেছে অনেক কম। শুক্র ও শনিবার কয়েক হাজার মানুষ এলেও তারা হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। কেবল দিকশির বিলই নয়, ‘বিলকুড়িয়ায়’ ‘কাটা বিল’সহ চলনবিলের অন্যান্য জলাশয়ের অবস্থাও একই। পদ্ম আর শাপলার স্থান এখন দখল করে নিয়েছে কচুরিপানা। পরিবেশবাদী ও স্থানীয়রা জানান, জলবায়ু পরিবর্তন ও মানবসৃষ্ট নানা কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, খরা এবং নদ-নদীর গতিপথ পরিবর্তনের কারণে জলজ উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে। ‘চলনবিল রক্ষা আন্দোলন’-এর প্রতিষ্ঠাতা এস এম মিজানুর রহমান বলেন, ‘প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর থাকা চলনবিল এখন টিকে থাকার লড়াই করছে। অনিয়ন্ত্রিত পর্যটন-পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করছে। শাপলা-পদ্মের জয়গায় এখন কচুরিপানা জেকে বসেছে।’ এছাড়া কৃষিজমিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক-বিলের পানি দূষিত করছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। এমন পরিস্থিতিতে চলনবিলের প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় পরিবেশবান্ধব পর্যটন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও বিলপ্রেমীরা।



২০ বছরের গ্যাস

প্রথম পৃষ্ঠার পর : প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণের কাজ আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে। গ্যাস কুপের জন্য সৃজনগর উপজেলার আহমেদপুর মৌজায় ৬ একর জমি অধিগ্রহণ করে বাপেস্ত্র-এর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। মূল খনন কাজের চুক্তি ও পরিকল্পনা ঠিকাদার হলো চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতীষ্ঠান সিএনপিসি চুয়ানকিং ডিলিং ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি (সিসিডিসি)। চীনা এই কোম্পানিটিই কুমিল্লার ‘শ্রীকাইল ডিপ-১’ কূপে খনন কাজ করছে। সেখানকার কাজ শেষ করে তারা মোবারকপুরে রিগ (খনন যন্ত্র) স্থানান্তর করবে। মূল খনন শুরুর সময় ২০২৮ সালের মাঝামাঝিতে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, মাটির নিচে রেকর্ড ৬,০০০ মিটার (৬ কিলোমিটার) গভীরে খনন করা হবে। সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২৮ সালের শেষ নাগাদ এখান থেকে বাণিজ্যিকভাবে গ্যাস উত্তোলন শুরু হতে পারে। ২০ বছর ধরে দৈনিক অন্তত ২০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। এই প্রকল্পে বাংলাদেশ সরকার ঋণ হিসেবে ৯০৯ কোটি টাকা এবং বাপেস্ত্র ২২৭.২৫ কোটি টাকার জোগান দেবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এর আগে ২০১৪ সালে এখানে বাপেস্ত্র ৮৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪.৫ কিলোমিটার গভীরতায় খননের উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু মাটির গভীরে অত্যধিক গ্যাসের চাপ ও প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির অভাবে তখন প্রকল্পটি অসম্পূর্ণ রেখেই স্থগিত করতে হয়েছিল। উল্লেখ্য, বর্তমানে যেখানে প্রকল্পের কাজ হচ্ছে সেটি আগের প্রকল্প এলাকা থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে। তবে কর্মকর্তারা জানান, পুরো অঞ্চলেই গ্যাসের প্রাচুর্যতা রয়েছে। এখন সঠিক একটি স্থানে কূপ খনন করে গ্যাস

উত্তোলন শুরু করতে পারলে পরপর আশেপাশে আরও একাধিক কূপ খনন করা যাবে। কর্মকর্তাদের আশা, বারবার পরিচালিত ভূ-কম্পন জরিপে প্রাপ্ত ইতিবাচক ফলাফল অনুযায়ী মোবারকপুরে বিপুল পরিমাণ গ্যাস মিলতে পারে। তারা জানান, সফল হলে এটিই হবে উত্তরবঙ্গের প্রথম কার্যকরী গ্যাসক্ষেত্র, যা থেকে অন্তত ২০ বছরের গ্যাসের চাহিদা মেটানো যাবে। পেট্রোবাংলার পরিচালক (পিএসসি, অপারেশনস) অ্যান্ড মাইনস) প্রকৌশলী মো. শোয়েব জানান, ২০১৪ সালে ৪.৫ কিলোমিটার খননের লক্ষ্য নিয়ে খনন কাজ করে নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছানোর পর তীব্র গ্যাস চাপের কারণে কাজ বন্ধ রাখতে হয়। এ চাপ অতিক্রম করে গভীরে যাওয়ার প্রযুক্তি তখন আমাদের কাছে ছিলনা বলেই সে সময় প্রকল্পটি সফলতা পায়নি। এখন সেই অভিজ্ঞতার আলোকে আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৬ কিলোমিটারের বেশি গভীরে খননকাজ পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মোবারকপুর ডিপ-১ প্রকল্পের পরিচালক এবং বাপেস্ত্রের উপ-মহাব্যবস্থাপক (অপারেশনস) এস এ এম মেরাজুল আলম বলেন, ৬ কিলোমিটারের বেশি গভীরে খননের জন্য উন্নত কারিগরি সক্ষমতার প্রয়োজন ছিল। এজন্য চীনা প্রতিষ্ঠান সিসিডিসি-র সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী সংস্থাটি খনন ও রিগ ফাউন্ডেশন নির্মাণ কাজ পরিচালনা করবে। তিনি নিশ্চিত করে জানান, ভূমি অধিগ্রহণ করে প্রকল্প এলাকার ভূমির উন্নয়ন ও পাইলিংয়ের কাজ চলছে। ২০২৮ সালের জুন মাসের মাঝামাঝিতে ড্রিলিং শুরু হবে।

প্রিয় স্বজন

‘সম্প্রীতি’তে আমরা অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করতে চাই। এ জন্য সবার সক্রিয় অংশ গ্রহণকে আমরা খুবই মূল্যবান বলে মনে করি। সম্প্রীতি হয়ে উঠুক আপনার মুখপত্র, সম্প্রীতি গড়ে তোলার অপরিহার্য আপনার ভূমিকাও, ‘সম্প্রীতি’র সঙ্গে থাকুন- এটাই আমাদের আন্তরিক কামনা। সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা- সম্প্রীতি সম্পাদনা পর্যদের পক্ষে-

অধ্যাপক শিবজিত নাগ

সম্প্রীতি বাংলাদেশ পর্যদ

অধ্যাপক আবু রইস, ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, অধ্যাপক আতাহার আলী, সাকিব লোহানী, জহিদ হায়দার, জাহাঙ্গীর আলম মুকুল, শাহনেওয়াজ খান স্বপন, ড. সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক, মোসতাসফা সতেজ, আমিরুল ইসলাম রাভা, আখতারুজ্জামান আখতার, মতিনুল হাসান মতিন, হা-মীম আবদুস সবুর, আখিনুর ইসলাম রেমন, কামাল সিদ্দিকী, আবদুর রশীদ, ডা. রাম দুলাল ভৌমিক, ডা. ফারহানা নীলা, অধ্যাপক মালা মাহবুব, ড. অফরোজা পারভীন, ডা. নূর উজ্জামান খোকন, অ্যাডভোকেট মোসফেকা জাহান কণিকা, বৃদ্ধা রায় দীপা, মধুমিতা মৈত্র, নাজিম উদ্দিন সরদার খোকা, অঞ্জন রায়, খোন্দকার আবদুল বাতেন আলোক।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক শিবজিত নাগ

সম্পাদনা পর্যদ
আবুল হোসেন খোকন
শ্যামল দত্ত
শুচি সৈয়দ

ফটো সম্পাদক
এস এম গোর্কি

শিল্প নির্দেশক
শিল্পী মোমিন উদ্দীন খালেদ

গ্রাফিক্স ডিজাইন
মাসুদ রানা
নাজমুস সায়াদ
খালেদ জাবেদ

প্রকাশনা সহযোগী
রনজু হোসেন

সম্পাদক ও প্রকাশক ইয়াসমিন হোসেন কর্তৃক রাইয়ান প্রিন্টার্স, ২৭৭/২এ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, নিউমার্কেট, ঢাকা-১২০৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
মোবাইল : ০১৯৭১-৮৬৯৮৯৭, ০১৭২৭-২৮২২৮৫
পাবনা অফিস : মিডিয়া সেন্টার, ৫ম তলা (লিফটের ৪), হাজী আক্তারুজ্জামান টাওয়ার, আবদুল হামিদ সড়ক, পাবনা।

ই-মেইল

sompriiti.pabna@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.sompriitibangladesh.com
ব্লগ
https://sompriitibangladesh.blogspot.com
ইউটিউব
https://www.youtube.com/@sompriitibd
e-mail : sompriiti.pabna@gmail.com
facebook : sompriiti.pabna

বরণীয় লোকসাহিত্যিক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৫), শেরে বাংলা জাতীয় পুরস্কার ও স্বর্ণপদক (১৯৮০), মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮২), একুশে পদক (১৯৮৩), নাসিরুদ্দীন স্বর্ণপদক (১৯৮৩), স্বাধীনতা পদক (১৯৮৪) এবং রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডি.লিট (১৯৮৭) উপাধিতে ভূষিত হন। অমূল্য সব কাজের স্বীকৃতি হিসেবে দেশ ও বিদেশ থেকে পেয়েছেন অনন্য সব সম্মান, স্বীকৃতি, সংবর্ধনা, পদক। তাঁর জীবনের শতাব্দীর কয়েক দশক তিনি কাটিয়েছেন রাজধানী ঢাকাতে। তাঁর ছিল হুঁকোবিলাস, জুতা ও ইংরেজিপ্রীতি। বাউল-ফকিরদের সঙ্গে তাঁর ছিল নিবিড় যোগাযোগ।

জন্ম তিনি ১৯০৪ সালের ৩১ জানুয়ারি পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার সাগরকান্দি ইউনিয়নের মুরারিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনেই ১৯২৫ সালে বিয়ে করেছিলেন রাজবাড়ীর মৌকুড়ির সাব-পোস্ট মাস্টার সফিউল্লাহর কন্যা শরিফুল্লাহা খানমকে। বিএ পড়তেন তখন। দ্বাদশ সন্তানের জনক ছিলেন তিনি।

শিক্ষা জীবন মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ছাত্র হিসেবে মেধাবী ছিলেন। তিনি খলিলপুর উচ্চ বিদ্যালয় হতে মেট্রিক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইএ, বিএ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইন্ডিয়ান বার্নাকুলার্সে প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে এমএ পাস করেন। তার আগে আর কোনো মুসলিম ছাত্র প্রথম শ্রেণী পায়নি। মাত্র দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় তিনি লোকসাহিত্য সংগ্রহের কাজ শুরু করেন। লোকসাহিত্য সংগ্রহে মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের আত্মনিবেদন ঘটে প্রবাসী পত্রিকা পাঠে, যা কলকাতা থেকে প্রকাশিত হত এবং পত্রিকাটির ওই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগৃহীত লালনের গান ছাপা হয়- যা কিশোর কবি মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনকে লালনের গান সংগ্রহে অনুপ্রেরণা জোগায়। পরবর্তী সময়ে প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে।

কর্ম জীবন কর্মজীবন শুরু করেন ১৯৩১ সালে সরকারি চাকুরী দিয়ে, স্কুল সাব ইন্সপেক্টর রূপে। তিন বছর চাকরি করার পর তিনি ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (স্কুল শাখা), হাওড়া জেলা স্কুল, চট্টগ্রাম সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এবং সিলেটের মুরারিচাঁদ কলেজে শিক্ষকতা করেন। ১৯৫২ সালে ছয় মাসের জন্য তিনি ঢাকায় সরকার পরিচালিত মাহে নও মাসিকপত্রের সম্পাদক ছিলেন। ওই বছরেরই শেষ দিকে সরকারি প্রতিনিধি হিসেবে তিনি আন্তর্জাতিক লোকসঙ্গীত সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে লন্ডন যান। সম্মেলনে ‘বেঙ্গলি ফোক সং’ নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করে মনসুরউদ্দীন সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। ওই সম্মেলনে ফোকলোর বিশেষজ্ঞ হিসেবে গণ্য হওয়ায় তাঁকে ‘ইন্টারন্যাশনাল ফোকসংস কাউন্সিল’-এর সদস্যপদ প্রদান করা হয়। লন্ডন থেকে ফিরে ওই বছরই তিনি ঢাকা কলেজে বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং ১৯৫৯ সালে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের আগে তিনি বেশ কিছুদিন ঢাকা



বরণীয় লোকসাহিত্যিক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের খন্ডকালীন অধ্যাপক ছিলেন।
সংগ্রহ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ সেনের অনুপ্রেরণায় সাহিত্যসাধনায় তাঁর হাতেখড়ি হয়। পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ ম্যাগাজিনে তাঁর

প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম ‘বেদুইন মুসলমান’। পরে সাম্যবাদী, প্রাচী ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর আরও কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়। দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় কলকাতা থেকে প্রকাশিত প্রবাসী পত্রিকা তাঁকে লালনগীতির সঙ্গে পরিচিত করায়। গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা এসব



মাথা ছাড়াই বিদ্যাশিক্ষা

প্রথম পৃষ্ঠার পর : আতিয়ার হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, অভিভাবক ছাড়া পরিবার যেমন চলতে পারে না, তেমনি প্রধান শিক্ষক ছাড়া স্কুলের শৃঙ্খলা থাকে না। দ্রুত এ পদে পদোন্নতি দেওয়া জরুরি। শিক্ষক ও সংশ্লিষ্টদের ভাষ্য, প্রধান শিক্ষক না থাকায় সহকারী শিক্ষকদের কাউকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দেয়া হলেও অনেক ক্ষেত্রে অন্য সহকর্মীরা তা সহজভাবে নেন না। এতে বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজে সমন্বয়হীনতা তৈরি হচ্ছে। দাপ্তরিক কাজেও নানা জটিলতা দেখা দিচ্ছে। তারা বলেন, প্রধান শিক্ষক না থাকায় নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক প্রশিক্ষণের সুযোগও সীমিত হয়ে পড়ে। প্রধান শিক্ষক না থাকায় লিডারশিপ ট্রেনিংও হয় না। অভিভাবকরা জানান, শিক্ষক সংকট আর প্রশাসনিক জটিলতায় পাবনার প্রাথমিক শিক্ষা খাত এখন অভিভাবকহীন। প্রধান শিক্ষক ছাড়াই জেলার অর্থেকেরও বেশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চলছে। দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ এ পদগুলো শূন্য থাকায় ব্যাহত হচ্ছে পাঠদান, প্রশাসনিক কার্যক্রম ও বিদ্যালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়ে কোনোরকমে কার্যক্রম চলায় একদিকে বাড়ছে শিক্ষকদের ওপর অতিরিক্ত চাপ, অন্যদিকে নজরদারি ও জবাবদিহি দুর্বল হয়ে শিক্ষার মান নিয়ে তৈরি হয়েছে উদ্বেগ। ভুক্তভোগী শিক্ষকদের ভাষ্য, সবমিলিয়ে খুব সুশৃঙ্খলভাবে বিদ্যালয় চলছে না। শৃঙ্খলা ফেরাতে সবার আগে সমস্যাগুলোর শিক্ষকদের পদোন্নতি ও প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন।

পাবনাকে যুক্ত করেই ওয়াই সেতু

প্রথম পৃষ্ঠার পর : সঠিক পরিকল্পনা দরকার। ৫শ বছরের বঞ্চনা আমরা এক দশকে বদলে দিতে পারবো। এই সুবর্ণ সুযোগ আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজে লাগাতে হবে। তিনি ১৬ আগস্ট দুপুরে পাবনা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় মৎস্য পক্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় এ কথা জানান। নির্ভরযোগ্য সূত্রের তথ্যানুযায়ী, এই সেতুটি নদীর মাঝে বা সংযোগস্থলে ইংরেজী ‘ওয়াই’ অক্ষরের মতো বিভক্ত হয়ে তিনটি ভিন্ন জেলা ও অঞ্চলকে একসঙ্গে যুক্ত করবে। এর মূল সংযোগস্থল হবে মানিকগঞ্জের আরিচা/পাটুরিয়া প্রান্ত। নদী পার হয়ে একটি বাহু চলে যাবে রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া (পদ্মা নদীর অংশ) অভিমুখে এবং অন্য বাহু চলে যাবে পাবনার কাজিরহাট (যমুনা নদীর অংশ) অভিমুখে। সূত্র জানায়, সেতুটি পদ্মা ও যমুনা নদীর মিলনস্থলের কাছাকাছি এমনভাবে নির্মাণের পরিকল্পনা করা হচ্ছে, যাতে এটি একইসঙ্গে দুই নদীর অংশকে যুক্ত করে। এ

লোকসঙ্গীত মনসুর উদ্দীনকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে। পরবর্তীকালে রাজশাহী কলেজে বিএ পড়ার সময় কলেজে অনুষ্ঠিত এক সাহিত্যসভায় তিনি ‘বাংলাদেশের পল্লীগান’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁর প্রবন্ধে মুগ্ধ হয়ে কলেজের অধ্যক্ষ কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে ফোকলোর চর্চায় উৎসাহিত করেন।

মনসুর উদ্দীন মনেপ্রাণে ছিলেন বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি, বিশেষত লোকসংস্কৃতির একজন একনিষ্ঠ অনুরাগী। ছাত্রজীবনে অধ্যয়নের ও পরবর্তীকালে অধ্যাপনার অবসরে তিনি পদ্মার চরাঞ্চল এবং পাবনা-ফরিদপুর-কুষ্টিয়ার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে গান, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, গল্প ইত্যাদি লোকসাহিত্যের অনেক উপাদান সংগ্রহ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ফোকলোর চর্চা দেশের সুধীমহলের স্বীকৃতি লাভ করে। বাংলাদেশ ফোকলোর পরিষদ, লালন পরিষদ (কেন্দ্রীয় সংসদ), লালন একাডেমী (কুষ্টিয়া), হরিশপুর লালন একাডেমী, পাঞ্জু শাহ সেবা সংস্কৃতি সংঘ ইত্যাদি সংস্থার উপদেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকরূপে মনসুর উদ্দীন আজীবন কাজ করে গেছেন। ১৯৭৮ সালের ৯ মার্চ বাংলাদেশ ফোকলোর পরিষদ মনসুর উদ্দীনকে সংবর্ধিত করে।

মনসুর উদ্দীনের প্রথম সংগ্রহ ছিল নিজ গ্রাম সুজানগরের মুরারীপুর গ্রামের প্রেমদাস বৈরাগীর কাছ থেকে সংগৃহীত লালনের একটি গান। পাঠিয়ে দেন প্রবাসীতে- যা ছাপা হয় ১৩৩০ সালের আশ্বিন সংখ্যায়।

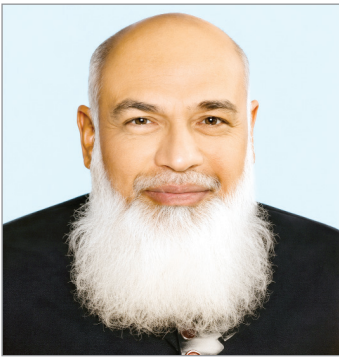
মনসুরউদ্দীন লোকসাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় প্রবন্ধ রচনা করে ভারতী, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, বিচিত্রা, মোহাম্মদী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তাঁর অক্ষয় কীর্তি হলো হারামনি (১৯৩০-১৯৮৯)। এর মোট ১৩ খন্ডে লোকসঙ্গীত সংকলন ও সম্পাদনা করে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। প্রতিটি খন্ডের সম্পাদনায় তিনি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও গভীর পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ: শিরনী (১৯৩১), ধানের মঞ্জরী (১৯৩৩), আগরবাতী (১৯৩৮), বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা (৩ খন্ড: ১৯৬০-৬৬) ও ইরানের কবি (১৯৬৮)। তাঁর রচিত মোট গ্রন্থসংখ্যা ৪২টি।

প্রকাশনা সমূহ

- লোকসাহিত্য : ১৩ খন্ডে সংগৃহীত লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় লোকসাহিত্যের সংকলন হারামনি
- লোককাহিনীর সংকলন শিরণী (১৯৩২)
- হাসি অভিধান
- বাংলা ইডিয়ম সংকলন (১৯৫৭)
- উপন্যাস : সাতাশে মার্চ
- বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস : বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ৩খন্ড একত্রে (১৯৮১)
- গানের সংকলন : শত গান (১৯৬৭), ইরানের কবি (১৩৭৫ বঙ্গাব্দ), আওরঙ্গজেব (অনুবাদ, ১৯৭০)
- রূপকথা সংকলন : ঠাকামি (১৯৫৯), মুসকিল আসান (২য় সং ১৯৫৯)
- অন্যান্য : হাসির পড়া (১৯৬৩)

মৃত্যু তিনি ১৯৮৭ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

[সৌজন্যে : আমরা সুজানগরবাসী ফাউন্ডেশন]



চলনবিদের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ,
লেখক ও সমাজসেবক অধ্যাপক
মো. আবদুল হামিদ-এর ২০তম
মৃত্যুবার্ষিকী ছিল গত ২৪ আগস্ট।
তাকে স্মরণ করে লেখাটি
প্রকাশ করা হলো।

- সম্পাদনা পর্যদ

১৯৫৬ সালের ৪ঠা জুলাই আমি পাবনার স্বনামধন্য এডওয়ার্ড কলেজের একজন শিক্ষক হবার সৌভাগ্য অর্জন করি। রসায়ন বিভাগের সর্বকনিষ্ঠ অধ্যাপকরূপে কলেজটিতে যোগদান করি। তখন রসায়ন বিভাগের প্রধান ছিলেন জাদরেল অধ্যাপক বসন্তকুমার ঘোষ (বি, কে, ঘোষ)। তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের হুগলীর বাসিন্দা। হুগলী শহরের সন্নিকটে তাঁর বাড়িতে যাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এই একই কলেজে তিনি আজীবন শিক্ষকতা করেন। তাঁর গভীর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও শিক্ষানুরাগ এবং সর্বোপরি বিদ্যাপীঠটির প্রতি ভালবাসা তাঁকে কিংবদন্তীর মানুষে পরিণত করেছিল। তাঁর চেহারা ছিল গুরুগম্ভীর; খুব কম কথা বলতেন, কিন্তু ক্রাশে তাঁর মুখে কথার খেঁ ফুটতো। লেখাপড়ার বিষয় ছাড়া অন্য কথা বলা তিনি পছন্দ করতেন না। অবশ্য মাঝে মাঝে রসিকতাও করতেন। রসায়ন বিভাগের ছোট কক্ষটিতে প্রথম দিন তাঁর সামনে চেয়ারে বসতে আমি কৃষ্ঠাবোধ করছিলাম। তিনি আমার সন্মোচ ভাব লক্ষ্য করে বলেন, ‘আপনি বসুন।’ আমি তাঁকে বিনয়ের সঙ্গে বলি, ‘স্যার, আপনি আমার পিতৃতুল্য। দয়া করে আমাকে আপনি না বলে তুমি বলবেন।’ তিনি হেসে বলেন, ‘সে হবে, হবে, আস্তে আস্তে হচ্ছে।’ অবশ্য পরদিন থেকে তিনি আমাকে তুমিই বলতেন এবং যতদিন ছিলেন আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। তৎকালে প্রশিক্ষণ শিক্ষক ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষকদের অধ্যাপক বলা হতো। এখনকার মত প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ইত্যাকার শ্রেণীবিন্যাস ছিল না। তখন অধ্যাপকদের প্রারম্ভিক বেতন ছিল মাসিক ১৭৫/০০ টাকা। প্রতি দুই বৎসর পর পাঁচ টাকা বেতন বাড়তো। অবশ্য বাজারে সব কিছু সস্তা থাকায় এই সামান্য বেতনে ভালভাবে সংসার চলেও কিছু উদ্বৃত্ত থাকতো।

রসায়ন বিভাগে আর একজন অধ্যাপক ছিলেন আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএসসি ক্রাশের সহপাঠী মীর মোহাম্মদ আলী। তাঁর বাড়ি ছিল সম্ভবত ফরিদপুর বা কুষ্টিয়া জেলায়। তিনি পাবনা শহরের জুবিলী ট্যাক্সের দক্ষিণে একটি বাড়ি কিনে পাবনার স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছিলেন। তখন রসায়ন বিভাগে একজন প্রদর্শন শিক্ষক ছিলেন মকবুল হোসেন বিশ্বাস। তাঁর বাড়ি ছিল পাবনার কুঠিপাড়ায়। কয়েক বৎসর পর মোজাম্মেল হোসেন নামে আর একজন প্রদর্শন শিক্ষক যোগদান করেন। তাঁরা উভয়েই একই কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

আমি কলেজটিতে যোগদানকালে অধ্যক্ষ ছিলেন মি. নলিনীরঞ্জন রায় (এন আর রায়)। তিনি ছিলেন পাবনা জেলার বেড়া থানার পোতাজিয়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে গণিত বিষয়ে প্রথম শ্রেণী লাভ করে এমএসসি পাশ করেন। তিনি শুধু অধ্যক্ষই ছিলেন না, একইসঙ্গে গণিত বিভাগের প্রধান ছিলেন। রুটিন মাসিক তিনি অংকের ক্রাশ নিতেন। নিরস গণিত বিষয়কে সহজ সরলভাবে বুঝিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হৃদয়গ্রাহী করে তুলতেন। ছাত্রদের মতে তিনি ছিলেন ‘অংকের যাদুকর’। এ-সব মন্তব্য ছাত্রদের মুখেই শোনা।

পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ছিলেন মি. মাখনলাল চক্রবর্তী। তিনি কলিকাতার বাসিন্দা ছিলেন। তিনিও এমএসসিতে প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্ত সুদক্ষ ও অতুলনীয় অভিজ্ঞ অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর এক পা ঝোঁড়া ছিল। তিনি মন প্রাণ ঢেলে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষাদান করতেন। ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর এক-একটি ক্রাশ হীরা মুক্তার চেয়েও দামী মনে করতো। তিনি তাদের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

তাঁর সম্পর্কে একটি ঘটনা মনে পড়ে; আই এসসি (উচ্চ মাধ্যমিক) পরীক্ষার ফরম পূরণ কালে তিনজন ছাত্রের পদার্থবিদ্যায় মাত্র একটি করে ‘পারসেন্টেজ’ কম পড়ায় তারা ‘ননকলেজিয়েট’ হয়। তখন নিয়ম ছিল প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে প্রতি বিষয়ে অন্তত শতকরা পঁচাত্তরটি ক্রাশে উপস্থিত থাকতে হোত, তবেই সে ‘কলেজিয়েট’ হিসেবে পরীক্ষা দিতে পারতো। যাদের উপস্থিতি শতকরা ৬০-৭৫ থাকতো তারা ‘ননকলেজিয়েট’ হিসেবে দশ টাকা জরিমানা দিয়ে পরীক্ষা দিতে পারতো। জরিমানার টাকা শিক্ষা বোর্ড পেতো। যাদের শতকরা ষাট-এর কম ‘পারসেন্টেজ’ থাকতো, তারা ‘ডিস্কলেজিয়েট’ হোত এবং পরীক্ষার

এডওয়ার্ড কলেজ নিয়ে স্মৃতিকথা

অধ্যাপক মো. আবদুল হামিদ

ফরম পূরণ করার সুযোগ পেত না। উল্লেখিত তিনজন ছাত্রের একমাত্র পদার্থবিদ্যা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের উপস্থিতি শতকরা পঁচাত্তর ছিল, বা করে নিতে পেরেছিল। শুধুমাত্র পদার্থবিদ্যায় একটি করে ‘পারসেন্টেজ’ কম ছিল। একটি ‘ডট’কে পি (চ) করে নিতে পারলেই আর কোন সমস্যা থাকে না। তিনজন পরামর্শ করে বুঝে সাহস করে পারসেন্টেজ-এর আবদার জানায়। তিনি সবকিছু শুনে ছাত্রদের বসতে বলে ভিতরে যান এবং তিনখানা দশ টাকার নোট এনে তাদের হাতে দিয়ে বলেন, ‘যাও, ফরম পূরণ করগে। তোমাদের জন্য আমি চোর হতে পারিনা। একটি ডটকে ‘পি’ করার অর্থই চুরি করা বা মিথ্যা বলা- যা জীবনে করিনি তা আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। তোমাদের জন্য আমি আমার পরকাল নষ্ট করতে পারিনা।’ তিনি বিরূপ সৎ ছিলেন- এই সামান্য ঘটনা থেকেই বোঝা যায়।

জীববিজ্ঞান বিভাগীয় প্রধান ছিলেন ডা. মনীন্দ্রনাথ রায়, এমবিবিএস। বিদ্যায় ডাক্তার হলেও তিনি পেশায় ছিলেন অধ্যাপক। অত্যন্ত কেতাদুরস্ত সুদর্শন ভদ্রলোক ছিলেন। ‘বো-টাই’ পরতেন। তিনি এমএন রায়ের মানবতাবাদী দলের অনুরাগী ছিলেন। তাঁর কাছে অনেক চাণক্য শ্লোক ও তুলসী দাসের দোঁহা শিখেছিলাম। তাঁর একটি কথা মনে পড়ে। তিনি বলতেন, হিন্দু ধর্মবিশ্বাসীদের জীবনযাত্রা কত সহজ। এতে বাধ্যতামূলক কিছুই নেই। পূজা করলেও হিন্দু, না করলেও হিন্দু। আমি হিন্দু- এ কথা স্বীকার করগেই যথেষ্ট। তিনি রসিকতা করে বলতেন- ইসলাম ধর্মে দৈনিক পাঁচ বার নামাজ, এক মাস রোজা, হজ্জ, জাকাত, কোরবানী কত কি করতে হয়। বড্ড কঠিন ব্যাপার। এ কথার উত্তরে বলতাম, যত গুড়, তত মিঠা। কষ্ট না করাই কেউ পেতে চান?

শুধুমাত্র বিজ্ঞান বিভাগেই নয়, মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগেও ছিলেন অনেক অভিজ্ঞ ও বয়োজ্যেষ্ঠ অধ্যাপক। অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আমিনুল হক, আরবী বিভাগে খন্দকার তোজাম্মেল হোসাইন ও মওলানা আবদুল হামিদ, উর্দু বিভাগে অধ্যাপক মোহাম্মদ দারা, দর্শনে অধ্যাপক এস কিউ হোসেন, ইতিহাসের অধ্যাপক হালিমুজ্জামান খান ও জালাল উদ্দিন, বাংলার অধ্যাপক গোলাম সাকলায়েন (পরে পিএইচডি), আনোয়ার পাশা (শহীদ বুদ্ধিজীবী) ও আনসার আলী, ইংরেজী বিভাগে অধ্যাপক খলিলুর রহমান, মুজিবুর রহমান, আবদুল কাদের ও রশিদুল হাসান (শহীদ বুদ্ধিজীবী), বাণিজ্য বিভাগে অধ্যাপক আবদুল কুদ্দুস প্রমুখ। সবাই ছিলেন নামকরা অধ্যাপক।

তৎকালে রাজশাহী কলেজের পরেই ছিল পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের স্থান। রাজশাহী কলেজ ছিল রাজশাহী ও খুলনা বিভাগদ্বয়ের একমাত্র সরকারী কলেজ। অনেক সময় এডওয়ার্ড কলেজের কাছে হার মানতো। এডওয়ার্ড কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের সুনাম ছিল দেশ জোড়া। এ কারণে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (পূর্ব বাংলার) অনেক দূরবর্তী জেলা হতে বহু ছাত্র এডওয়ার্ড কলেজে বিজ্ঞান পড়তে আসতো। এই কলেজের বহু ছাত্র আইএসসি ও বিএসসি পরীক্ষায় শীর্ষ স্থান ও প্রথম দশ জনের মধ্যে স্থান লাভ করে কলেজটির গৌরব বৃদ্ধি করে। শুধু বিজ্ঞান বিভাগেই নয়, মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগেও এডওয়ার্ড কলেজের ফলাফল অনুরূপ গৌরবোজ্জ্বল ছিল।

আমি এডওয়ার্ড কলেজে এসে আইএসসি প্রথম বর্ষে ও ২য় বর্ষে (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে) দু’টি করে

সেকশনে (শাখায়) চারটি ক্রাশ, আর বিএসসি তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে দু’টি ক্রাশ পাই। রসায়ন বিভাগের তিনজন শিক্ষককে দৈনিক ছয়টি তত্ত্বীয় ক্রাশ নিতে হোত। এ ছাড়া ছিল ব্যবহারিক ক্রাশ। আইএসসি ক্রাশের ব্যবহারিক ক্রাশে প্রদর্শন শিক্ষক সব সময় উপস্থিত থাকলেও অধ্যাপকদের রুটিন অনুযায়ী দেখতে হোত। অধ্যাপক বি কে ঘোষ সপ্তাহে ২ দিন করে বিএসসি ক্রাশের ৪ টি করে ভৌত রসায়নের তত্ত্বীয় ক্রাশ ও ব্যবহারিক ক্রাশ নিতেন। সকল ক্রাশে মীর মোহাম্মদ আলী পড়াতেন জৈব রসায়ন, আর আমি পড়াতাম অজৈব রসায়ন। ইন্টারমিডিয়েট ক্রাশের ভৌত রসায়ন আমরা অংশ ভাগ করে পড়াতাম। তৎকালে শিক্ষার মাধ্যমে ছিল ইংরেজী। বাংলা ছাড়া সকল বিষয়ের বই ছিল ইংরেজীতে। শিক্ষাদান ও পরীক্ষা ইংরেজী ভাষাতেই হোত। ১৯৬৫ সালের পর হতে ক্রমান্বয়ে ইংরেজীর স্থান দখল করে বাংলা ভাষা।

অধ্যাপক মীর মোহাম্মদ আলী আমি যোগদানের অল্পদিন পরই শিল্প বিভাগে সরকারী চাকুরী পেয়ে ঢাকায় চলে যান। ফলে, তাঁর ক্রাশগুলো আমাকেই নিতে হোত। প্রতিদিন চার-পাঁচটি তত্ত্বীয় ক্রাশ, তার উপর ব্যবহারিক ক্রাশ নিতে অবস্থা কাহিল হয়ে উঠতো। প্রায় দিনই অবিরাম পরিশ্রমের পর সন্ধ্যায় গলদঘর্ম হয়ে বাসায় ফিরতাম।

একদিন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ঘোষ মহাশয়কে রসায়ন বিভাগে একজন শিক্ষক নিয়োগের কথা বলি। তিনি অধ্যক্ষ মহোদয়ের সঙ্গে আলাপ করলে তিনি সম্মত হন। যথারীতি বিজ্ঞপ্তি প্রচারের পর পাবনার জেলা প্রশাসনের অফিসে প্রার্থীদের সাক্ষাতকারের ব্যবস্থা হয়। তখন জেলা প্রশাসক ছিলেন কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি। প্রার্থীদের মধ্যে দু’জন ছিলেন আমাদের প্রাক্তন ছাত্র : আবদুল হালিম শিকদার ও শ্রীপদ দাস। শ্রীপদ দাস রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিষয়ে এমএসসিতে প্রথম শ্রেণী ও স্বর্ণপদক লাভ করেন। আবদুল হালিম শিকদারও একজন কৃতি ছাত্র ছিলেন। আমি ও অধ্যাপক বি কে ঘোষ উভয়েই সাক্ষাতকার বোর্ডে ছিলাম। আরো ছিলেন জেলা প্রশাসক ও অধ্যক্ষ মহাশয়। আমাদের সামনে বিরাট সমস্যা দেখা দিলঃ কাকে বাদ দিয়ে কাকে নিয়োগ করা যায়? অবশেষে আমার অনুরোধে উভয়কেই নিয়োগের জন্য নির্বাচিত করা হয়। তারা কলেজে যোগদান করেন। কিছুকাল পর অধ্যাপক শ্রীপদ দাস এডওয়ার্ড কলেজের চাকুরী ছেড়ে ভারতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগর কলেজে যোগদান করেন। তার শূন্যপদে বয়েনউদ্দিন আহমেদকে অধ্যাপক নিয়োগ করা হয়। অধ্যাপক আবদুল হালিম শিকদার পাবনা সরকারী এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষরূপে অবসরগ্রহণ করেন। অধ্যাপক বয়েনউদ্দিন আহমেদ রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে কিছুকাল দায়িত্ব পালনের পর একদিনের জন্য এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করে সরকারী চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করেন।

ষাটের দশকে অধ্যক্ষ এন আর রায়, অধ্যাপক বি কে ঘোষ ও অধ্যাপক মাখনলাল চক্রবর্তী এডওয়ার্ড কলেজ হতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁদের বিদায় সংবর্ধনা সভায় বক্তা, দর্শক, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষকবর্গ যারা উপস্থিত ছিলেন অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি। সেদিনের দুঃখ ভারাক্রান্ত স্মৃতি জীবনে ভুলতে পারবনা। জীবনে বহু বিদায় সভায় যোগদান করেছি, কিন্তু অন্য কোথাও অনুরূপ উদ্বেলিত হৃদয়ের কান্না

চোখে পড়েনি। তাঁরা তিনজনই এই কলেজ ছেড়ে যাবার পর বেশী দিন বাঁচেননি। সবাই একে একে পরকালের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। তাঁদের জীবদ্দশায় শেষবারের মত হুগলীতে গিয়ে অধ্যাপক বি কে ঘোষ এবং কলিকাতার রাশা রোডের বাড়ীতে অধ্যাপক এম এল চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। অনেকদিন পর তাঁরা আমাকে কাছে পেয়ে যে কিরূপ খুশী হয়েছিলেন তা ভাষায়

ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। বসন্ত বাবুর ছোট ছোট নাটী নাতনীরা এসে যখন আমাকে প্রণাম করে, আমি বিচলিত হয়ে পড়ি। কি করবো ভেবে পাইনা। তাদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করি। প্রবীণ শিক্ষকদ্বয় আমাকে নিজ হাতে বহুকিছু পরিবেশন করে খাওয়ান। সেদিনের স্মৃতিও মনের মণিকোঠায় চির অম্লান হয়ে থাকবে। অধ্যাপক বি কে ঘোষের অস্ত্রীক্রিয়ার পর তাঁর পুত্র আমাকে চিঠি লিখে তাঁর পিতার মৃত্যু সংবাদ জানান। আমরা কলেজে শোকসভা করেছিলাম।

এডওয়ার্ড কলেজে চাকরি করবো- এটা ছিল আমার অনেক দিনের আশা। কেননা কলেজটি ছিল উন্নতমানের ও নামকরা। দ্বিতীয়ত, আমার নিজ থানা গুরুদাসপুরের কাছে অবস্থিত। পাবনায় থাকার সুযোগ পেলে পশ্চাৎপদ চলনবিল অঞ্চলের জন্য কিছু করার সুযোগ পাব। এটাই ছিল চিন্তার বিষয়। ১৯৫২ সালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে রসায়ন বিষয়ে এমএসসি পরীক্ষা দেই। আবাসিক ছাত্র ছিলাম সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের। শেখ মুজিব (বঙ্গবন্ধু) তখন ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র। তিনি বাইরে বাস করলেও এস এম হলের অ্যাটর্নি ছিলেন। সেই সুবাদে ও বাংলা ভাষা আন্দোলন নিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রায়ই সাক্ষাৎ হোত। আমাদের মধ্যে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি যুক্ত ফ্রন্টের আমলে দুর্নীতি দমন দপ্তরের মন্ত্রী থাকাকালে কয়েকবার সাক্ষাৎ করেছিলাম। তাঁর সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ হয় ১৯৭৪ সালে রাজশাহী শহরে। এমএসসি পরীক্ষা শেষ করে আমি ঢাকা জেলার করোনীগঞ্জ থানার কলাতিয়া স্কুলে কয়েক মাস শিক্ষকতা করি। পরীক্ষার ফল বের হলে তৎকালীন খুলনা জেলার সাতক্ষীরা কলেজে রসায়ন বিষয়ের শিক্ষকরূপে যোগদান করি ১৯৫৩ সালের আগস্ট মাসে। কয়েক মাস পর সাতক্ষীরা কলেজ ছেড়ে রংপুর জেলার গাইবান্ধা কলেজে যাই। গাইবান্ধা কলেজে থাকাকালে ১৯৫৫ সালে আমি একদিন পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে বেড়াতে আসি এবং অধ্যক্ষ এন আর রায় মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করে আমার বি এস সি এবং এম এস সি-র রেজাল্ট জেনে নিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করেন, ‘আপনি এডওয়ার্ড কলেজে আসতে চান?’ আমি সম্মতি জানালে তিনি বলেন, ‘আগামী মাসে প্রথম সপ্তাহেই নিয়োগপত্র পাঠাব। পেলেই চলে আসবেন।’ আমি তাঁকে কথা দিয়ে বিদায় গ্রহণ করি। গাইবান্ধা কলেজ কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানাই। কিন্তু পরবর্তী মাসের ১৫/২০ তারিখের মধ্যেও নিয়োগপত্র পাইনা। পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, আমার নাম প্যানেলে দুই নম্বরে আছে। এক নম্বরে আছে- মুরারী মোহন চক্রবর্তী এম এসসি (ফাস্ট ক্রাশ)। তাঁকে নিয়োগ করা হয় এবং তিনি যথাসময়ে কাজে যোগদান করেন। খবরটি জেনে স্বভাবতই মন খারাপ হয়। আমি গাইবান্ধা কলেজ থেকে বিদায় নিয়ে নভেম্বর মাসে রংপুর কারমাইকেল কলেজে যোগদান করি। কয়েক

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

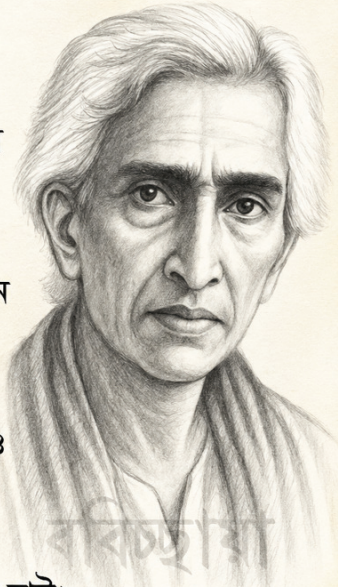


স্মরণ

দেড় শতাব্দীর শরৎচন্দ্র

যাহাকে ভালবাসি, সে যদি
ভাল না বাসে, এমন কি
ঘৃণাও করে, তাও বোধ করি
সহ্য হয়, কিন্তু যাহার
ভালবাসা পাইয়াছি বলিয়া
বিশ্বাস করিয়াছি, সেইখানে
ভুল ভাঙ্গিয়া যাওয়াটাই
নিদারুণ। পূর্বেরটা ব্যথাই
দেয়, কিন্তু শেষেরটা ব্যথাও
দেয়, অপমানও করে।
আবার এ ব্যথার প্রতিকার
নাই, এ অপমানের নালিশ নাই।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



মোসতাফা সতেজ

অপ্রতিদ্বন্দ্বি কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী ১৫ সেপ্টেম্বর। ১৮৭৬ সালের এইদিনে তিনি হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে ভূমিষ্ঠ হন। তাঁর পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। মা ভুবন মোহিনী। হুগলি ব্রাহ্ম স্কুলে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী অবস্থায় মামার বাড়ি ভাগলপুরে আশ্রয় নেন। ১৭ বছর বয়সে কাশীনাথ ও কাকবাসা গল্প রচনা করেন। ১৮৯৪তে এন্ট্রাস পরীক্ষায় ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৬-এ মায়ের মৃত্যু হয়। এ বছর পরীক্ষার ফি সংগ্রহ করতে না পারায় এফএ পরীক্ষা দিতে পারেননি। ১৯০২ সালে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। নিজ সম্পর্কে তিনি লেখেন, ‘আমার শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিদ্রের মধ্যদিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। অর্থের অভাবেই আমার শিক্ষা লাভের সৌভাগ্য ঘটেনি। পিতার নিকট হতে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকার সূত্রে আর কিছুই পাইনি। পিতৃদত্ত প্রথম গুণটি আমাকে ঘরছাড়া করেছিল। আমি অল্প বয়সেই সারা ভারত ঘুরে এলাম। পিতার দ্বিতীয় গুণের ফলে জীবনভর আমি কেবল স্বপ্ন দেখেই গেলাম। আমার পিতার পান্ডিত্য ছিল অগাধ। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা- এক কথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়েছিলেন। কোনটাই শেষ করতে পারেন নি।’ এক গভীর মানবতা ও দায়িত্ববোধ থেকে তিনি নারী উন্নয়নের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। এই বোধ তাঁর মনে জন্ম নিয়েছিল সৃজনবৃত্তে আত্মনিয়োগের পর। সামাজিক মানুষের দারিদ্রজনিত দুঃখ দুর্দশা আর নির্যাতন অনুভব করে। নারীর বাইরের সৌন্দর্য নয়, অন্তরের সৌন্দর্য উদঘাটনেই শরৎচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল। এটা অনুভবের কথা। তাঁর লেখায় নারীর দৃশ্যমান রূপ বর্ণনা তেমন বিস্তৃত হয় নি। কিন্তু তার অন্তরের সৌন্দর্যকে তিনি গল্প কথনের অনুযুগে প্রকাশের প্রয়াস পেয়েছেন। বৃত্তান্ত : সন্ন্যাসীর বেশে ধর্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ। ১৯০৩ বার্মা যাত্রা। মন্দির নামক গল্পটির জন্য কুন্ডলীন পুরস্কার লাভ। রেঙ্গুনে থাকাকালীন বিয়েতে বসেন। স্ত্রী শান্তি দেবী। প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে স্ত্রী ও ছেলের মৃত্যু। দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন হিরন্ময় দেবীকে। ১৯০৬ সালের এপ্রিলে মাসিক ৫০ টাকা বেতনে একজামিনার অফ পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টে কেরানির চাকরিতে যোগদান করেন। ১৯২২ সালে রেঙ্গুনের একাউন্টেন্ট জেনারেল অফিসে পুনর্নিযুক্তি হয়। ১৯১৩ সালে ‘বড়দিদি’ গ্রন্থ আকারে প্রকাশ। ১৯১৫-তে ভারতবর্ষ পত্রিকায় নিয়মিত লেখক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯১৬ সালে পা ফেলা রোগে আক্রান্ত

হয়ে রেঙ্গুন থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। ১৯১৯ এ বসুমতি কার্যালয় থেকে ‘শরৎচন্দ্র গ্রন্থাবলী’র প্রথম খন্ড প্রকাশ হয়। ১৯২১ কংগ্রেসে যোগদান করেন। নির্বাচিত হন হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি। এর তিন বছর পর নির্মল চন্দ্রের সহযোগিতায় ‘রূপ ও রঙ্গ’ নামে সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯২৭ সালে নাট্যকার হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯২৯ সালে অনুষ্ঠিত ঢাকার মালিকান্দার অভয় আশ্রমে ও রংপুরে বঙ্গীয় যুব সম্মিলনের সভায় সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩৬ সালে ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের অধিবেশনেও সভাপতির আসনে বসেন। ৬২ বছরের জীবনে তিনি ২৫টি উপন্যাস লিখেছেন। ছোট গল্প গ্রন্থও রয়েছে বেশ কিছু। আছে প্রবন্ধ। উপন্যাসের মধ্যে অরক্ষণীয়া (১৯১৬), ১৯১৩ সালে বড়দিদি। ১৯১৮ সালে ‘দত্তা’। ১৯২০ সালে ২টি উপন্যাস ‘বামনের মেয়ে’ ও ‘গৃহদাহ’। ১৯২৩ সালে ‘দেনা পাওনা’। ১৯২৬ সালে ‘হরিলক্ষ্মী’ ও ‘পথের দাবী’। ‘পথের দাবী’ উপন্যাসটি রাজনৈতিক। স্বদেশি আন্দোলন নিয়ে লেখা। বইটি ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে। ১৯৩৫ সালে ‘বিপ্রদাশ’। ১৯৩৪ সালে ‘বৈকুণ্ঠের উইল’। ১৯৩১ সালে ‘শেষ প্রশ্ন’। পতিতার প্রতি তাঁর সহানুভূতির প্রথম পরিচয় মেলে ‘শুভ দা’ (১৯৯৮) উপন্যাসে। তাঁর শেষ উপন্যাস ‘শেষের পরিচয়’ প্রকাশিত হয় মৃত্যুর পরে, ১৯৩৯ সালে। লেখাটি অসম্পূর্ণ ছিল। অনেকটা আত্মজীবনী মূলক লেখা ‘শ্রী কান্ত’ (৪খন্ড) ১৯১৭ থেকে ১৯৩৩ সালে ধাপে ধাপে প্রকাশিত হয়। তাঁর অনেক উপন্যাসই চলচ্চিত্র হয়েছে। এর মধ্যে ‘দেবদাস’ বাংলা ও হিন্দি ভাষায় হয়। ছোট গল্পের মধ্যে বিলাসী, মামলার ফল ও অনুপমার প্রেম উল্লেখযোগ্য। ১৯০১ সালে বড়দিদি, শুভ দা, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি রচনা করেন। তাঁর গল্পগুলোও বাস্তব রসে সমৃদ্ধ। চরিত্র সৃষ্টিতেও চমকে দিয়েছেন। যা পাঠকের প্রাণ ছুঁয়ে যায়। মেজদিদি, মহেশ, একাদশী বৈরাগী, অভাগীর স্বর্ণ, বিলাসী, পরেশ, অনুপমার প্রেম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ‘আঁধারের আলো’ গল্পটি প্রসিদ্ধি লাভ করে। ‘মহেশ’ ও ‘সতী’ গল্প তাঁর শ্রেষ্ঠ লেখা। ‘মন্দির’ গল্পটিতে শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম হিসেবে আলোচিত হয়েছে। শরৎ সাহিত্যের নায়ক-নায়িকারা খুবই সাধারণ। তাদের মুখে বিদ্রোহের সুরও বাজে। নিছক নিসত্তা বর্ণনা তিনি দেননি। আবহমান বাঙালি সমাজের সুখ-দুঃখ অনুধাবন করে তা প্রকাশ করে গেছেন। তাঁর লেখায় যতখানি দূরদৃষ্টি আছে, তার অধিকই বর্তমানে মিশে থাকা। প্রথম উপন্যাস ‘বড় দিদি’ প্রকাশ হয় ১৯১৩ সালে, তার শেষ উপন্যাস ‘শুভদা’ প্রকাশ হয় ১৯৩৮ সালে। ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিলিট উপাধি পান। ১৯২৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথীর্ণী স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৩৮ সালের ১৬ জানুয়ারি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনাবসান ঘটে কলকাতার পার্ক নার্সিং হোমে।

এডওয়ার্ড কলেজ নিয়ে স্মৃতিকথা

৪-এর পৃষ্ঠার পর : কলেজে এসে যোগদান করি। প্রথম দিন আমাকে কোন ক্লাশ নিতে দেয়া হয়না। পরদিন থেকে ক্লাশ নিতে শুরু করি। পূর্বে আমি যে কয়টি কলেজে ছিলাম, সেখানে একাদশ শ্রেণীর প্রথম দিন রসায়নের ক্লাশে কতিপয় বিজ্ঞান ভিত্তিক খেলা বা ম্যাজিক দেখিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের রসায়ন বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট করার প্রয়াস পেতাম। এডওয়ার্ড কলেজে তার ব্যতিক্রম হয়নি। রসায়ন বিজ্ঞানে মজার মজার খেলা নিয়ে পরবর্তীকালে আমার ‘রসায়নের তেলেসমাতী’ বই প্রকাশ করি। আমার পূর্ববর্তী কলেজসমূহে বিজ্ঞান প্রদর্শনী করেছিলাম। এর উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রছাত্রী ও জনগণের মধ্যে বিজ্ঞান মনন সৃষ্টি করা। এডওয়ার্ড কলেজে এসে মাননীয় অধ্যক্ষ ও বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে পর পর কয়েক বছর তিনদিনব্যাপী বিজ্ঞান প্রদর্শনী করা হয়। প্রদর্শনী দেখার জন্য এত দর্শকের ভীড় জমতো, যা নিয়ন্ত্রণ করা ছিল খুবই কঠিন ব্যাপার। বিজ্ঞান বিভাগের সকল শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, বেয়ারা সবাই বিজ্ঞান প্রদর্শনীর সাফল্যের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। এমনকি বয়োবৃদ্ধ অধ্যাপক মাখনবাবু, বসন্তবাবু ও মণিবাবু পর্যন্ত অসাধারণ পরিশ্রমের ফলে গলদঘর্ম হয়ে উঠতেন। পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশে সরকার প্রতি বৎসর বিজ্ঞান মেলার ব্যবস্থা করছেন। কিন্তু সে-সব অত্যন্ত গতানুগতিক ও নিষ্প্রভ। আর একটি ব্যাপারে ছাত্রদের বিশেষ উৎসাহ পেয়েছি। তা হল, প্রতি বৎসর বি এস সি ক্লাশের ছাত্রদের নিয়ে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা সফর ও বিভিন্ন শিল্প কারখানা দেখানো। এজন্য তাদের সামান্য বিশ-ত্রিশ টাকা বাসভাড়া বাবদ দিতে হলেও তারা যা শিক্ষা লাভ করতো- তা পরিমাপ করা যায় না। বিভিন্ন স্থানের শিল্পপতি ও কারখানার কর্মকর্তাগণ সফরকারী ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের জন্য রাজকীয় আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতেন। এডওয়ার্ড কলেজে এসে এক ব্যাপারে খুবই অসুবিধায় পড়ি। সামান্য খাম, পোস্ট কার্ড কিনতে বা চিঠি পোস্ট করতে অনেক দূরে হেড পোস্ট অফিসে যেতে হয়। পোস্ট অফিসের সঙ্গে আমার নিত্যদিনের সম্পর্ক ছাত্র জীবন থেকে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী খুলনার আবদুস সবুর খানকে চিঠি লিখে এডওয়ার্ড কলেজে একটি পোস্ট অফিস প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করি। অতঃপর তিনি পাবনায় সফরে এলে তাঁর সঙ্গে সার্কিট হাউসে সাক্ষাৎ করে পাবনায় একটি নৈশ পোস্ট অফিস প্রতিষ্ঠার দাবি জানাই। তিনি সেইদিনই পাবনা প্রধান ডাকঘরে নৈশ পোস্ট অফিস খুলে দেন। কলেজটিতে আর একটি অভাব অনুভব করি। কলেজ গেটের দক্ষিণ পাশে ছিল ছোট একখানা টিনের নামাজের ঘর, যেখানে বিশ জনেরও একসঙ্গে জামাতে নামাজ আদায়ের স্থান সঙ্কুলান হোতনা। মুসলমান ছাত্রদের নামাজ পড়ায় কিছুটা উৎসাহিত করায় ধীরে ধীরে নামাজীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। মাথায় চিন্তা জাগে, কি করে কলেজে একটি মসজিদ করা যায়? মুসলিম ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে আলোচনা সভা করে মসজিদ প্রতিষ্ঠার

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অধ্যাপক কে এম টি হোসাইন সাহেবকে সভাপতি এবং অধ্যাপক হালিমুজ্জামান খানকে সম্পাদক করে একটি ‘মসজিদ প্রতিষ্ঠা কমিটি’ গঠিত হয়। প্রত্যেক মুসলিম ছাত্র বেতনের সঙ্গে এক টাকা মসজিদের জন্য আর আট আনা (৫০ পয়সা) ইসলামী পাঠাগারের জন্য দিতে সম্মত হয়। অধ্যক্ষ এন আর রায় মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে কলেজ অফিসে বেতনের সঙ্গে মসজিদের টাকা আদায় হতে থাকে। পাবনার হাজী আবদুর সোবহান ও আরো কতিপয় ব্যক্তি কলেজে মসজিদ হবে জেনে স্বেচ্ছায় এসে অর্থ দান করে যান। তখন কলেজে মুসলিম ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছিল প্রায় দুই হাজার। প্রতি মাসে মসজিদের জন্য টাকা জমা হতে থাকে। এই সময়ে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান পাবনা সফরে আসেন। মসজিদের সাহায্যের জন্য তাঁর কাছে একখানা দরখাস্ত পেশ করা হয়। তিনি দশ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। অতঃপর ইট কিনে ফুরফুরা শরীফের পীর হজরত আবদুল হাই সিদ্দিকী সাহেবের হাতে মসজিদের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে বর্তমান দ্বিতল কলেজ মসজিদ ও ইসলামী পাঠাগার। ১৯৬৬ সালে আমার উপর এডওয়ার্ড কলেজের টাউন হোস্টেলের সুপারের দায়িত্ব অর্পিত হয়। হোস্টেলটি ছিল জেলা পাড়ায় শিল্প সঞ্জিবনী হোসিয়ারীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাশে (এডভোকেট আবদুর রাজ্জাক সাহেবের বর্তমান বাড়ি)। মাত্র ত্রিশ চল্লিশ জন ছাত্র হোস্টেলে থাকতো। তাদের অধিকাংশই চাপাইনবাবগঞ্জের। এ কারণে হোস্টেলটি ‘চাপাই নবাবগঞ্জ মেস’ নামে পরিচিত ছিল। প্রকৃতই এটা ছিল এক পরিত্যক্ত ভাঙ্গা দালানে এক প্রাইভেট মেস। ছাত্রদের নিরাপত্তা ও দেখাশোনার জন্য অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রতি তিন বছর মেয়াদের জন্য একজন অধ্যাপককে সুপার নিয়োগ করা হোত। মেসটিকে কলেজ হোস্টেলে রূপদানের ইচ্ছায় ভবনটির কিছু সংস্কার, নামাজের ঘরের ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের ব্যবস্থা, মাঝে মাঝে ছুটির দিনে ছাত্রদের নিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অভিযান করতাম। তাদের নিয়ে প্রতি শুক্রবারে বাদ জুম্মা সাহিত্যসভা, স্বরচিত কবিতাপাঠ, ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক আলোচনা, বিতর্ক সভা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতাম। ছাত্রদের লেখাপড়ায় উৎসাহিত করার ফলে টাউন হোস্টেলের ছাত্রদের পরীক্ষার ফল ‘মেইন’ হোস্টেলের চেয়ে ভাল হোত। প্রায় সকল পরীক্ষার্থীই ভালভাবে পাশ করতো। সর্বাধিক গৌরবজনক বিষয় ছিল- টাউন হোস্টেলের প্রতিটি ছাত্র নিয়মিত নামাজ পড়তো। কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাদের অনেককেই নেতৃত্ব দিতে দেখা যেতো। পরবর্তীকালে রসায়ন বিভাগে শিক্ষক ছিলেন আবদুল হালিম শিকদার, বয়েনউদ্দিন আহমেদ, মোহাম্মদ আলী, আবদুর রশিদ, রহমতুল্লাহ, দলিল উদ্দিন মন্ডল ও আবকমল হোসেন। প্রদর্শন শিক্ষক ছিলেন মকবুল হোসেন বিশ্বাস ও মোজাম্মেল হোসেন। বেয়ারার সুরেন, নরেশ, আ. ওয়াহেদ, নুরুল ইসলাম, আবদুল আজিজ, নাসির উদ্দিন ও আবদুল কাদের। সবার মুখ মনের মুকুরে ভেসে

উঠছে। প্রাইভেট কলেজ হেতু এডওয়ার্ড কলেজে চাকরীর পাশাপাশি স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস-এর চীফ কমিস্ট (১৯৫৬-৬৮) এবং পাবনা মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন বিষয়ের শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতাম। ১৯৫৮ সাল থেকে প্রায় এক যুগ ধরে পাবনা থেকে প্রকাশ করতাম মাসিক ‘আমাদের দেশ’ পত্রিকা। পত্রিকাটির ইংরেজী সংস্কর ‘আওয়ার হোম’ লন্ডন থেকে এবং উর্দু সংস্করণ ‘হামারা ওয়াতান’ প্রকাশিত হোত। তিনটিরই প্রধান সম্পাদক ছিলেন রায়গঞ্জ থানার চান্দাইকোনার ব্যারিস্টার এ এম আক্বাস। তিনি লন্ডনে থাকতেন। সকল ছাত্র ‘আমাদের দেশ’ পত্রিকার সহ-সম্পাদক ও কর্মী ছিল। পরবর্তীকালে তারা নামকরা সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের মর্যাদা লাভ করে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। ‘আমাদের দেশ’ ও চলনবিল অঞ্চলের কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রকাশনা ছাড়াও আমাকে ঢাকার ‘দৈনিক পয়গাম’ পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা, কোয়েটার ত্রিভাষী পত্রিকা ‘বোলানের ডাক’-এর নিজস্ব প্রতিনিধি, ‘আওয়ার হোম’ পত্রিকার পাকিস্তানের প্রতিনিধির দায়িত্বও পালন করতে হোত। এছাড়া বই লেখার প্রতিও কিছুটা ঝোঁক ছিল। এডওয়ার্ড কলেজে থাকাকালীন সময়ের মধ্যে আমার লেখা ‘চলনবিলের ইতিকথা’ ‘জ্ঞানের মশাল’ ‘কর্মবীর সেরাজুল হক’ ‘পল্লী কবি কারামত আলী’ ‘পশ্চিম পাকিস্তানের ডাইরী’ ও কয়েকখানা কলেজ পাঠ্য বই পাবনা থেকে প্রকাশ করি।

আমার উদ্যোগ ও সহায়তায় পাবনা শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়- পাবনা শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ সমিতি, মোজাহিদ ক্লাব, অভিযান ক্লাব, পৈলানপুর যুবক সমিতি, জেলাপাড়া মাতৃমঙ্গল সমিতি, রাধানগর নারীকল্যাণ সমিতি, পাবনা বিজ্ঞান সমিতি, পাবনা জেলা সাহিত্য পরিষদ, পাবনা সাহিত্য মজলিশ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান। এতদ্ব্যতীত পাবনা ইসলামিয়া কলেজ পরবর্তীকালে শহীদ রুলবুল কলেজ, পাবনা মহিলা কলেজ ও আইন কলেজ প্রতিষ্ঠায় আমার বিশেষ ভূমিকা ছিল। ১৯৬৮ সালের ১লা মার্চ এডওয়ার্ড কলেজ সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়। রসায়ন বিভাগের একমাত্র আমি সহকারী অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ পাই। রসায়ন বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকগণ প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পান। আমার সহকর্মী ও প্রাক্তন ছাত্র আবদুল হালিম শিকদার আমার পরেই ছিলেন রসায়ন বিভাগের সিনিয়র শিক্ষক। তাকে সহকারী অধ্যাপক না করায় তিনি অত্যন্ত মনক্ষুণ্ণ হন। তার জন্য আমি ঢাকায় গিয়ে প্রায় সপ্তাহ ধরে তদবীর করার ফলে তিনি সহকারী অধ্যাপক পদে উন্নীত হয়ে যশোহর এম. এম. কলেজে বদলী হন। অতঃপর ১৯৬৯ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর আবদুল হালিম শিকদার যশোহর এম.এম. কলেজ হতে বদলী হয়ে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে আসেন। আমি তাঁকে দায়িত্ব হস্তান্তর করে তার ছেড়ে আসা যশোহর এম. এম. কলেজে সহকারী অধ্যাপক পদেই যোগদান করতে যাই। এখানেই অবসান ঘটে আমার এডওয়ার্ড কলেজে সাড়ে তের বছর চাকুরী জীবনের।





সোমবার
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬



‘অন্তর মম বিকশিত করে/অন্তরতর হে। / নির্মল করে উজ্জ্বল করে, / সুন্দর করে। / জগ্রত করে, উদ্যত করে, / নির্ভয় করে হে। / মঙ্গল করে, নিরলস নিঃসংশয় করে হে। / অন্তর মম বিকশিত করে, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করে হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করে হে বন্ধ, / সঞ্চার করে সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করে হে, / নন্দিত করে, নন্দিত করে, / নন্দিত করে হে। / অন্তর মম বিকশিত করে/ অন্তরতর হে।’



সম্প্রীতি
বাংলাদেশ

শাহীন রহমান

আকাশে শরতের পূর্ণিমার চাঁদ, নিচে গ্রামের উঠোনে মাদুর পেতে বসেছেন দর্শকরা। সামনে জলচৌকিতে বসেছেন একজন পাঠক। হারিকেন আর কুপি বাতির আলোয় এক মায়াময় পরিবেশ। চারপাশে সুনসান নিরবতা। আলো আধারীর মাঝে ভেসে আসে পুঁথি পাঠের সুর।

কয়েক দশক আগে হারিয়ে যাওয়া এমন দৃশ্যের দেখা মেলে চলনবিল বিধৌত পাবনার চাটমোহর উপজেলার বিলচলন ইউনিয়নের সোনাহারপাড়া গ্রামে। গত ২৭ আগস্ট রাতে ওই গ্রামের প্রয়াত কিতাব প্রামাণিকের বাড়ির উঠোনে বসে গ্রামবাসীর লোকজ ঐতিহ্য পুঁথি পাঠের আসর। শহরের কোলাহল ছেড়ে নিস্তর্র রাতে ধরা দেয় বাংলার মাটির আসল সৌন্দর্য। সময়টা যেন হঠাৎ ফিরে যায় আশির দশকে।

চাটমোহর উপজেলা সদর থেকে চার কিলোমিটার উত্তরে চলনবিল পাড়ের এক নিভৃত পল্লী সোনাহারপাড়া গ্রাম। চাটমোহর জারদিস মোড় থেকে মান্নানগর ভাঙাচোরা আর ধুলোবালির সড়ক পেরিয়ে গ্রামে ঢুকতে ইট বিছানো পথ। সেই পথ মাড়িয়ে আয়োজনস্থলে পৌঁছাতে রাত সাড়ে আটটা। বাড়ির উঠোনে একপাশে খড়ের পালা, অপর পাশে পুঁথি পাঠের আয়োজন। প্রচন্ড ভ্যাপসা গরমে গ্রাহি অবস্থা। তখন অনেকেই এসেছেন দেখতে। আয়োজকরা ব্যস্ত সব প্রস্তুত করতে। মাথার উপর তখন চাঁদ আলো ছড়িয়েছে। কুপি বাতি আর হারিকেন জ্বলছে। ঠিক বিশ্বকবি রবী ঠাকুরের সেই অমর সঙ্গীত ‘আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে, বসন্তের এই মাতাল সমীরণের’ মত। রাত সোয়া নয়টা থেকে শুরু হয়ে পুঁথি পাঠের আসর, চলে রাত সোয়া দশটা পর্যন্ত। তার আগে উঠোনে পাতা মাদুরে বাড়তে থাকে গ্রামের নারী-পুরুষ, শিশু কিশোর, তরুণ তরুণী দর্শকের সংখ্যা। এক সময় দর্শকে পরিপূর্ণ হয়ে যায় আসর। শুধু চাটমোহর উপজেলার নয়, ঢাকা থেকেও আসেন সংস্কৃতিপ্রেমি কয়েকজন।

বিপ্লব আচার্য্যের সঞ্চালনায় শুরুতে পুঁথি পাঠের আসরের মুখবন্ধ পাঠ করেন আয়োজক ডা. আতিকুর রহমান আতিক। এরপর শুরু হয় পুঁথি পাঠ। আসরে বিবি সোনাভান পুঁথি পাঠ করেন নব্বই দশকের নাট্যজন ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আসাদুজ্জামান দুলাল। গাজী কালু ও চম্পাবতী পুঁথি পাঠ করেন লইমুদ্দিন প্রামাণিক। শেষে তাদের হাতে সম্মাননা ট্রেস্ট তুলে দেন আয়োজকরা। পুঁথি পাঠের গায়নে তার মায়াবি সুরের জাদুতে মাতিয়ে তোলেন দর্শক শ্রোতাদের। জ্যোৎস্না রাতে মুগ্ধতায় ভাসেন সবাই। ছোটবেলায় দাদা-দাদির মুখে গল্প শোনা পুঁথি পাঠের আসর স্বচক্ষে দেখে আগ্রহ হন দর্শক শ্রোতারা। এ যেন শেকড়ের সুরে ফিরে যাওয়া। পুঁথি পাঠ শুনতে এসেছিলেন সন্তোষ কৃষক



পুঁথি পাঠের আসরে পুঁথি পাঠ করছেন আসাদুজ্জামান দুলাল। সামনে মন্ত্রমুগ্ধ দর্শক। ছবি : সম্প্রীতি বাংলাদেশ

পুঁথিপাঠে ঐতিহ্যের শেকড়

‘...জ্যোৎস্না রাতে সবাই...’

বাড়ির উঠোনে একপাশে খড়ের পালা, অপর পাশে পুঁথি পাঠের আয়োজন। প্রচন্ড ভ্যাপসা গরমে গ্রাহি অবস্থা। তখন অনেকেই এসেছেন দেখতে। আয়োজকরা ব্যস্ত সব প্রস্তুত করতে। মাথার উপর তখন চাঁদ আলো ছড়িয়েছে। কুপি বাতি আর হারিকেন জ্বলছে। ঠিক বিশ্বকবি রবী ঠাকুরের সেই অমর সঙ্গীত ‘আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে, বসন্তের এই মাতাল সমীরণের’ মত। রাত সোয়া নয়টা থেকে শুরু হয়ে পুঁথি পাঠের আসর, চলে রাত সোয়া দশটা পর্যন্ত। তার আগে উঠোনে পাতা মাদুরে বাড়তে থাকে গ্রামের নারী-পুরুষ, শিশু কিশোর, তরুণ তরুণী দর্শকের সংখ্যা। এক সময় দর্শকে পরিপূর্ণ হয়ে যায় আসর। শুধু চাটমোহর উপজেলার নয়, ঢাকা থেকেও আসেন সংস্কৃতিপ্রেমি কয়েকজন।

হাসান প্রামাণিক। তিনি বলেন, ৪০ বছর আগে শুনেছিলাম। তখন মুরব্বীরা আয়োজন করতো। ভালই লাগতো। আমরা কৃষিকাজ করতাম। অবসরে আসরে বসে পুঁথি পাঠ শুনতাম। এত বছর পর আয়োজনটা ভালই লাগলো।

ছেলেকে নিয়ে এসেছিলেন অবসরপ্রাপ্ত প্রকৌশলী ইমদাদুল হক। তার ভাষা, ছোটবেলায় যখন আমি স্কুলে পড়তাম, তখন নানা বাড়িতে বৈঠকখানাতে এইরকম পুঁথি পাঠের আসর বসতো। এত বছর পর

পুঁথি পাঠ দেখে ও শুনে সেই ছোটবেলায় ফিরে গিয়েছিলাম। এখন তো মোবাইলে ডুবে গেছি আমরা। আমাদের দেশীয় ঐতিহ্যকে ধরে রাখা দরকার। ফয়সাল মাহমুদ সদ্য নামের এক তরুণ বলেন, আসলে পুঁথি পাঠ কি আমি জানতাম না। ফেসবুকে আয়োজনের প্রস্তুতি দেখে ডা. আতিককে ফোন করে জেনেছি। আগে কখনও দেখিনি। তাই আব্বুর সঙ্গে পুঁথি পাঠ দেখতে এসে খুব ভাল লাগলো।

চাটমোহর প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি রকিবুর রহমান টুকুন বলেন, যখন সারা পৃথিবী এআই প্রযুক্তিতে ডুবে আছি, সেখানে এই পুঁথি পাঠের আসর আয়োজন একটি বিরল ঘটনা। কারণ শত শত বছরের ঐতিহ্য আমরা ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছি। আমাদের পরিচিত হলো আদি সংস্কৃতি। তারই অংশ পুঁথি পাঠ। এটাকে ধরে রাখতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণে সরকারের এগিয়ে আসা উচিত। পুঁথি পাঠ করতে পেরে আবেগ আপ্তত

নাট্যজন আসাদুজ্জামান দুলাল। তিনি বলেন, আগে যখন গ্রামে পুঁথি পাঠ শুনতাম তখন থেকেই সুরটা আমার মধ্যে ছিল। আমি পাঠক না হলেও আজ প্রথম পাঠ করলাম। এতে আমার মনে হলো, মানুষের মধ্যে একাত্মতাবোধ তৈরি ও পাশাপাশি আনতে পুঁথিপাঠের মতো গ্রামবাসীর হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যগুলো ধরে রাখতে হবে। এখনকার গল্প দিয়ে যদি পুঁথি বাধা যায় তাহলে মানুষকে সুন্দর পথের স্বপ্ন দেখানো সম্ভব।

আয়োজক ডা. আতিকুর রহমান আতিক বলেন, আমাদের ঐতিহ্যবাহি বর্ণালী একটা সাংস্কৃতিক ইতিহাস আছে। তার অন্যতম হলো পুঁথি পাঠ। সেই ষোলশ সতেরোশ শতকের। আশি-নব্বই সাল পর্যন্ত নিভু নিভু করে জ্বলছে। বর্তমানে একদমই বিলুপ্ত প্রায় একটি সংস্কৃতি। অনেকে জানেই না এই পুঁথি পাঠটা আসলে কি। আমরা ফিরে যেতে চেয়েছি সেই সময়টায়, দেখতে চেয়েছি কেমন ছিল পুঁথি পাঠের আসর। মূলত সেই হারিয়ে যাওয়া লোকজ সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে নতুন প্রজন্মের মাঝে তুলে ধরতে এই আয়োজন।

পুঁথি পাঠের আসরের আয়োজনের খবর জানতে পেরে ঢাকা থেকে দেখতে এসেছিলেন পাঁচবার জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শব্দ প্রকৌশল রিপন নাথ। তার ভাষা, খুবই ভাল একটি আয়োজন। নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। তবে এখন যদি পুঁথি পাঠ টাকে জনপ্রিয় ও মানুষের কাছাকাছি নিয়ে যেতে চান তাহলে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে নতুন করে গল্প তৈরি করতে হবে। যাতে মানুষের শোনার আগ্রহ বাড়ে। তাহলে এটাকে আবার ফিরিয়ে আনা সম্ভব।



পুঁথি পাঠের আসর



ছবি : সম্প্রীতি বাংলাদেশ

কবে মিলবে রূপপুরের

প্রথম পৃষ্ঠার পর : বিদ্যুত কেন্দ্রটিতে ফিউশন রিয়াকশন ঘটিয়ে পাওয়ার স্টার্টআপের কাজ শুরু হবে । বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি উৎপাদনে যাওয়ার আগে (বি-টু-থাপে) দুই থেকে তিন সপ্তাহ এবং টারবাইন দিয়ে ৩০% স্ট্রীম তৈরিতে ছয় সপ্তাহ মিলে মট নয় সপ্তাহ সময় লাগবে । এই হিসেবে আইডিয়াল প্রোগ্রাম যদি অনুসরণ করা হয়, তাহলে আগামী নভেম্বর মাসে উৎপাদনে আসবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুত কেন্দ্র । একটি সূত্র বলছে, প্রকল্প নির্মাণে জড়িতরা এখনও ফিউশন রিয়াকশনে যেতে পারেননি । ফিউশন রিয়াকশনে যাওয়ার আগে গুরুত্বপূর্ণ একটি পরীক্ষা রয়েছে । একে বলা হয়- প্রেসারাইজার পাইলট অপারেটেড রিলেটেড ভালব (পিওআরভি) । এই পরীক্ষাটিতে এ খন পর্যন্ত সফল হওয়া যায়নি । পিওআরভি শেষে যখন ফিউশন রিয়াকশন ঘটানো হবে তখন সেই পরীক্ষাতেও কারিগরি ত্রুটি দেখা দিতে পারে । পিওআরভি-তে ৯০টি পরীক্ষার মধ্যে ৮৯টিতে এসে আটকে গেছে কর্তৃপক্ষ । এরপর যখন ফিউশন রিয়াকশন ঘটানো হবে তখন শুধু ত্রিটিক্যাল পরীক্ষাই থাকবে ১৮টি । এই ১৮টির মধ্যে এক-দুইটিতে কারিগরি ত্রুটির জন্য কর্তৃপক্ষ আটকে যেতেই পারে । এক্ষেত্রে শিডিউল অনুযায়ী রূপপুরের কাজ সময়মতো শেষ হওয়া নিয়ে কিছু অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে । রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুত কেন্দ্র নির্মাণের প্রকল্প পরিচালক ড. মো. কবীর হোসেন গণমাধ্যমকে বলেন, আইডিয়াল প্রোগ্রাম যদি অনুসরণ করি তাহলে আগামী নভেম্বরের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি উৎপাদনে যেতে পারে বলে আশা করছি । কিন্তু শেষ মুহূর্তে কোন পরীক্ষায় আটকে গেলে সময় আরও পেছাতে পারে । তিনি আরও বলেন, শিডিউল অনুযায়ী রূপপুরের প্রথম ইউনিটের উৎপাদনের আসার এক বছর পর দ্বিতীয় ইউনিটের উৎপাদনে আসার কথা । কিন্তু মাঝখানে করোনা ও ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে প্রকল্পের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা যায়নি । এতে ২য় ইউনিট থেকে কিছু যন্ত্রপাতি এনে প্রথম ইউনিটের কাজ চালিয়ে যেতে হয়। ফলে ২য় ইউনিটের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি আবার নতুন করে সরবরাহের জন্য ঠিকাদার এরইমধ্যে অর্ডার দিয়েছে। এই যন্ত্রপাতিগুলোর কিছু এসে গেছে, কিছু এখনও আসছে। যন্ত্রপাতিরা এই সরবরাহ ব্যবস্থা বিদ্বিষ্ট হওয়ায় এবং আবার বাইরে থেকে এনে স্থাপন করার কারণে কাজের যে অগ্রগতি তাতে ২য় ইউনিটের উৎপাদন এক বছর পর শুরু করা বেশ কঠিন হয়ে পড়বে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, এই প্রকল্পে বিষয়ে রাশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের আরও কিছু চুক্তি সম্পন্ন করা বাকি রয়েছে । এগুলো হল- অপারেশনাল সাপোর্ট, রিপেয়ার মেইনটেনেন্স এবং স্পেয়ার পার্টস সরবরাহের সহযোগিতা সংক্রান্ত তিনটি চুক্তি । তবে এই চুক্তিগুলো করার বিষয়ে প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে ।

নিষিদ্ধ ১০ নিত্যপণ্য

শেষের পৃষ্ঠার পর : বাঘাবাড়ীর ‘ঘি’তে নেই ‘ঘি’ (মিক্স ফ্যাট); পাম অলিন ও বনস্পতি দিয়ে তৈরি করে ‘ঘি’ নামে বাজারজাত করা হচ্ছে । বাংলাদেশ মানের চেয়ে নিম্নমানের ঘি ও বাটার অয়েল প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে বাঘাবাড়ী প্রিমিয়াম ঘি কোম্পানির ‘বাঘাবাড়ী’ ব্র্যান্ডের ঘি, কিশোরগঞ্জ ফুড প্রোডাক্টস ‘অরুন বাঘাবাড়ী’ ব্র্যান্ডের ঘি, মেসার্স মামুন ফুড প্রোডাক্ট ‘নিউ রাধুণী’ ব্র্যান্ডের ঘি, মেসার্স মামুন ফুড প্রোডাক্টের ‘সিটি’ ব্র্যান্ডের ঘি এবং এলডার্স ফুড প্রোডাক্টস অ্যান্ড প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজের ‘এলডার্স’ ব্র্যান্ডের বাটার অয়েল । এ ছাড়া বম্বে সুইটসের মসলা বাংলাদেশ মান (বিডিএস) থেকে বিভিন্ন প্যারামিটারে নিম্নমানের পাওয়া গেছে । ল্যাবরেটরি পরীক্ষার প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা গেছে, বম্বে সুইটস অ্যান্ড কোং লিমিটেডের উৎপাদিত কারি পাউডার হাঁসের মাংসের মসলা, তেহারি মসলা, কালাভুনা মসলা, গরুর মাংসের মসলা ও মাছের মসলা মান উত্তীর্ণ হতে পারেনি । বিএসটিআই মহাপরিচালক (সচিব) কাজী ইমদাদুল হক বলেন, জাতীয় মান অনুসারে পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখা প্রতিটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের আইনি ও নৈতিক দায়িত্ব । কোনো প্রতিষ্ঠান এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে বিএসটিআই প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নিতে বদ্ধপরিকর । বিএসটিআই পণ্যের মান সনদ দেওয়ার পাশাপাশি নকল ও ভেজাল ঠেকাতে কঠোর নজরদারি বজায় রেখেছে । তিনি ক্রেতাদেরকে পণ্য কেনার আগে বিএসটিআইয়ের মানচিহ্ন, লাইসেন্স নম্বর, উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ, পণ্যের উপাদান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য যাচাই করার পরামর্শ দিয়েছেন । একই সঙ্গে তিনি কোনো পণ্যের মান, ভেজাল, প্রতারণা অথবা বিএসটিআইয়ের মানচিহ্নের অপব্যবহার-সংক্রান্ত অভিযোগ থাকলে তা ১৬১১৯ নম্বরে অথবা dg@bsti.gov.bd ই-মেইলে জানাতে অনুরোধ করেছেন ।

বিপজ্জনক হতে পারে

শেষের পৃষ্ঠার পর : মানুষকে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে পারে । এ বিষয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কীটতত্ত্ববিদ অধ্যাপক কবিরুল বাশার গণমাধ্যমকে জানান, আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লে স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যু সংখ্যাও বাড়বে। শুধু তাই নয়, অস্ট্রোবেরেও আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার কাছাকাছি থাকবে । এদিকে রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) পরিচালক ডা. কাজী আহমেদ জাকী জানিয়েছেন, ডেঙ্গু নিয়ে আমরা উদ্বেগজনক অবস্থায় আছি । দিনদিন আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে । অন্যদিকে, হামের কারণে আমাদের স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলো এমনিতেই অতিরিক্ত চাপের মধ্যে রয়েছে । এর মধ্যে ডেঙ্গু নতুন করে বাড়তি চাপ তৈরি করছে । তিনি উল্লেখ করেন, বৃষ্টিপাত ও জলাবদ্ধতার কারণে এডিস মশার প্রজননের উপযোগী স্থান বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি মশা নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিতে ঘাটতি ডেঙ্গুর সংক্রমণ বাড়ার অন্যতম কারণ । বর্ষাকালে জলাবদ্ধতা বেড়ে যায় । বাংলাদেশে আমরা আমাদের পরিবেশও সেভাবে ব্যবস্থাপনা করতে পারি না । তবে বর্ষাকে ঠেকানো সম্ভব না হলেও চাইলে মশার বিস্তারকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব । তাঁর মতে, ভেক্টর (রোগের বাহক) নিয়ন্ত্রণ না করা গেলে ডেঙ্গুকে নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব নয় । কারণ এটি মানুষ থেকে মানুষে সরাসরি ছড়ায় না, ছড়ায় মশার মাধ্যমে । ডেঙ্গু সংক্রমণের কারণ এবং এডিসের প্রজননস্থল সব এলাকায় একরকম নয় । তাই এলাকার পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে । স্থানীয় সরকার ও সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো মশা নিয়ন্ত্রণ এবং লার্ভা নির্মূল কার্যক্রম জোরদার করলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হবে ।

খমকে থাকা হামিদ রোড!

শেষের পৃষ্ঠার পর : এআর কর্ণার মার্কেটের সামনে তাকালে মনে হয় এ জায়গায় মেটির সাইকেলের শো রুম করা হয়েছে । শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ডের পাশ দিয়ে রবিউল মার্কেটের রাস্তায় যেতে ডায়াবেটিকস হাসপাতালের পাশের মোড়ে অটোবাইক চালকদের মোড় দখল করে যাত্রী তোলার ঘটনা সাধারণ মানুষের জন্য সীমাহীন বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে । রবিউল মার্কেটের পাশে এডভোকেট মাসুদ কমপ্লেক্সের মোড়ের অবস্থাও বেসামাল । এ সড়কে সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বড় বাজার, গোপালপুর শিশু শিক্ষা নিকেতন, হলি চাইল্ড স্কুল, বেশ কয়েকটি কোচিং সেন্টার রয়েছে । শিক্ষার্থীসহ সাধারণ মানুষের জন্য এখান দিয়ে চলাচল সীমাহীন কষ্টকর । ট্রাফিক পুলিশ ও পৌর ট্রাফিক সদস্যরা হিমশিম খাচ্ছেন মানুষের ভোগান্তি দূর করতে । এদিকে যানজট নিরসন, সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধের লক্ষ্যে গত ২৫ আগস্ট থেকে আট দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করছে সদর ট্রাফিক পুলিশ । অভিযানকালে হেলমেট না পরা, অবৈধ পার্কিং, যানবাহনের বৈধ নথিপত্র না থাকা এবং ট্রাফিক আইন অমান্য করার দায়ে অনেক মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন যানবাহন জব্দ এবং মামলা দায়ের করা হয় । অভিযানে নেতৃত্বদানকারী শহর ও যানবাহন পুলিশ পরিদর্শক সাদাকাতুল বারি জানান, শহরের যান চলাচল স্বাভাবিক ও সুশৃঙ্খল রাখতে আগামীতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে । ট্রাফিক পুলিশের এই সময়োপযোগী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় সচেতন নাগরিক ও সাধারণ পথচারীরা ।

মৌমিতার মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

গত ৯ সেপ্টেম্বর ছিল প্রবীণ সাংবাদিক রুমী খন্দকারের একমাত্র মেয়ে জান্নাতুল ফেরদৌস মৌমিতা’র প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীর দিন। মৌমিতা ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব পালনের সময় গত বছরের এইদিনে রুদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মৃত্যুবার্ষিকীতে মৌমিতার পৈত্রিক বাড়ি পাবনার আরিফপুরে মিলাদ মাহফিল এবং দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও পরিবারিকভাবে পালন করা হয় বিভিন্ন কর্মসূচি।



বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুল পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন পাবনা কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিজয়ীরা

দুর্লভের দিকে

শেষের পৃষ্ঠার পর : জানা গেছে, ১৯০৭ সালে পদ্মার উত্তর তীরে অবস্থিত তৎকালীন সারা ঘাট বন্দর থেকে ৭শ ২২ মণ ইলিশ বিভিন্ন স্থানে রফতানি করা হয়েছিল । এখানে ইলিশের প্রাচুর্যতা থাকায় এই ঘাটে স্থাপিত হয়েছিল একটি বরফ কল। প্রায় ৪ কেজি ওজনের ইলিশ পাওয়া গিয়েছিল সুজানগরে। এখন সে সব ইতিহাস। মাঘ মাসে আগে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের দেবী সরস্বতী পূজার সময় এবং পরে মাঘী সপ্তমী তিথিতে ইলিশ মাছ পূজা করা হতো। এ ধারা এখন অনেক খানি বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

মৎস বিশেষজ্ঞরা জানান, ইলিশ নদীর মোহনা এলাকায় বাস করে। প্রজনন মৌসুমে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) বা ডিম ছাড়ার সময় উজানের দিকে যাত্রা শুরু করে। মেঘনা নদীর মোহনা এবং সুজানগরে-বেড়া উপজেলার সীমানা এলাকা বাইশ কোদালিয়ার মোহনা হতে ঝাঁক বেঁধে ইলিশ উজানে রওয়ানা দিত। কিন্তু এখন তলদেশ ভরাট। ডিম ছাড়ার পর পরই ইলিশ মোহনায় ফিরে আসে।

পদ্মার ইলিশের রূপ স্বাদ ও ভ্রাণ মাছের তেলের ওপর নির্ভরশীল হলেও অন্যান্য নদীর ইলিশ থেকে পদ্মার ইলিশের স্বাদের গুনমান আলাদা রকমের। তাই দামও বেশি। জেলার জলজ পরিবেশসহ জলবায়ুগত উপাদানের ওপর এ মাছের উৎপাদন নির্ভরশীল। পদ্মা নদীর তলদেশের প্রকৃতি, পানির গভীরতা, পানি ও বাতাসের চাপ, প্রোত, তাপমাত্রা, আলো, পানিতে দ্রবীভূত গ্যাস সমূহ এবং সামাজিক সাড়া প্রভৃতি গবেষণায় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নদীতে বিশাল বিশাল চর জেগে ওঠায় লোনা পানির ইলিশ মিষ্টি পানিতে ডিম ছাড়ার জন্য ঝাঁক বেঁধে আসতে পারছে না বলে পদ্মায় ইলিশ উৎপাদন কমে গেছে।

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। একক প্রজাতি হিসেবে সর্ব বৃহৎ এবং সর্বাপ্রেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এ মাছ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে নদী তীরবর্তী শিকারী জেলেরা যথেষ্ট সচেতন ছিলেন না। ইতিহাসে আরও উল্লেখ, ব্রিটিশ আমলে নদীয়া জেলার সদরপুরের কায়স্থ জমিদারেরা ঈশ্বরদী হতে বেড়ার বাইশ কোদালিয়ার মোহনা পর্যন্ত এই অংশটুকু জলকরের মালিক ছিলেন। তারাই জেলেদের কাছ থেকে বার্ষিক খাজনা আদায় করতেন। জাতীয় মাছ ইলিশ আমাদের ঐতিহ্যের অংশ মাছে ভাতে বাঙালির স্বাশত এই পরিচয়েই নিহিত রয়েছে আমাদের জীবনে মাছের গুরুত্ব। বাংলাদেশের বিশাল সমুদ্রসীমা উপকূলীয় এলাকা ও মোহনা ইলিশের আবধ বিচরণ ক্ষেত্র। সরকার মৎস্য খাতের বিশেষ করে ইলিশের বিপুল সম্ভাবনা ও গুরুত্ব বিবেচনা করে এর উন্নয়নে বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। গৃহস্থের রান্নাঘরের গভি পেরিয়ে ইলিশ এখন ব্র্যান্ড হিসেবে বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরছে।

পাবনা কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ

৮৮ ক্ষুদে খেলোয়াড়ের জমজমাট টুর্নামেন্ট

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

জেলা প্রশাসন পাবনা পরিচালিত পাবনা কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের বার্ষিক ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৬ এর ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান গত ২৩ আগস্ট বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থেকে বিজয়ী এবং বিজিত দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন জেলা প্রশাসক ও প্রতিষ্ঠানের সভাপতি আমিনুল ইসলাম। জমজমাট এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) ও প্রতিষ্ঠানের সদস্য সচিব উম্মে তাবাসসুম। এ সময় প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষক ও কয়েকশ শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। প্রতিষ্ঠানের মোট ৮৮ জন ক্ষুদে ফুটবল খেলোয়ার ৮ টি দলে বিভক্ত হয়ে টুর্নামেন্টে অংশ নেয়। দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী মুশফিক মনোয়ার মাহি এবং সাইমাম ইসলাম-এর দলের মধ্যে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় সাইমাম ইসলাম-এর দল চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

ফাইনাল খেলাটি পরিচালনা করেন প্রতিষ্ঠানের সহকারী শিক্ষক জুয়েল রানা। প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক তাঁর বক্তব্যে টুর্নামেন্টের সার্বিক কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করে আগামীতে সকল প্রকার খেলাধুলাসহ সহশিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখার নির্দেশ প্রদান করেন। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ প্রফেসর শিবজিত কুমার নাগ অনুষ্ঠানে ব্যক্তিগত কারণে উপস্থিত হতে না পারলেও একটি সফল টুর্নামেন্ট সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সব শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।



পাবনা কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের বার্ষিক ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান ও বিশেষ অতিথিসহ শিক্ষকদের সঙ্গে খেলোয়াররা

-সম্প্রীতি বাংলাদেশ



রিকশা-অটোর ধাক্কায় ‘হায় হায় অবস্থা’

থমকে থাকা হামিদ রোড!

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

শহুরে ব্যস্ততার চাপে এখন পাবনার সড়ক পথও ভাবনায় ফেলেছে। শহরের প্রধান পথ আবদুল হামিদ রোড এখন রীতিমত জঙ্গল হয়ে গেছে। অটো, রিকশা, বাইক আর রাস্তার উপর বিস্তৃত হওয়া মালপত্র বোঝাই ফুটপাথের কারণে পায়ে হেঁটে চলাচলও দুশ্বর হয়ে উঠেছে। অপ্রশস্ত একই সড়কে প্রায় বিশ রকমের যানবাহন চলাচল করছে। বেদখল হওয়া দুপাশের ফুটপাথ দিয়েও হাটা যাচ্ছেনা। ফলে প্রতিদিনই রিকশা ও অটোর ধাক্কায় আহত হচ্ছে হেঁটে চলা মানুষ। সবমিলে সড়ক পথ এখন ‘হায় হায়’ অবস্থা তৈরি করেছে। প্রাপ্ত তথ্য বলছে, গত কয়েক মাসে অটোর ধাক্কা খেয়ে এই সড়কের বিভিন্ন স্থানে মৃত্যুবরণ করেছেন বেশ কয়েকজন। আবার শহরজুড়ে প্রায় সব দোকানিই তাদের দোকানের সামনে ফুটপাথের উপর ব্যবসা করার জন্য মাসিক ভাড়ায় বরাদ্দ দিচ্ছেন নানা পসরা সাজিয়ে বসা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের। বাই সাইকেল, অটোবাইক, রিকশা, বৌ রিকশা, ভ্যান, কাভার্ড ভ্যান, রিফ্রিজারেটরিভদের মোটর সাইকেল, নানা দোকানের পণ্য পরিবহনের গাড়ি, ডিলারশীপের গাড়িসহ আরওসব যানবাহনের চাপে সড়কটির এখন অস্থির দশা।

গুধু আবদুল হামিদ সড়ক নয়, বেনিয়াপাড়ার অবস্থা আরও করুণ। পাঁচমাথা মোড় থেকে চেষ্টার অব কমান্স ভবন দিয়ে যাওয়া খলিফাপাড়া মোড় পর্যন্ত প্রায় সব ব্যবসায়ীর মালামাল রাখা হচ্ছে দোকানের সামনের ফুটপাথে। দেখা গেছে, দোকানের ভেতরে থাকা মালামালের অর্ধেকই সাজিয়ে রাখা হয় দোকানের সামনে ফুটপাথ ঘেঁষে। আবদুল হামিদ সড়কের এআর প্লাজা ও

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

মশা নিয়ন্ত্রণ জরুরি বিপদজনক হতে পারে ডেঙ্গু পরিস্থিতি

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

এডিস মশার জন্ম ও দ্রুত এর বিস্তৃতির কারণে ডেঙ্গু পরিস্থিতি আরও বিপদজনক দিকে চলে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে বলা হয়েছে, গত আগস্ট থেকে আগামী অক্টোবর মাসকে ডেঙ্গুর ‘পিক সিজন’ বলা হয়। ফলে এখন ডেঙ্গু আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা যেমন ব্যাপকভাবে বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে মৃত্যুও। এরইমধ্যে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে দেড়শতধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, চলতি সেপ্টেম্বর ডেঙ্গু পরিস্থিতির জন্য সবচেয়ে খারাপ

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

ট্রেন সার্ভিস ও বিমান বন্দর চালু নিয়ে আশাবাদ

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

ঢাকা-পাবনা সরাসরি ট্রেন সার্ভিস এবং ঈশ্বরদী বিমান বন্দর চালুর বিষয়টি এখন অপেক্ষার তালিকায় যুক্ত হয়েছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলোর তথ্যানুযায়ী, ভারত থেকে কোচ আসার সঙ্গে ঢাকা-পাবনা সরাসরি ট্রেন সার্ভিস চালুর বিষয়টি আলোচনায় থাকলেও স্থানীয় নানা পক্ষের ভূমিকাও এ ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা তৈরি করেছে। বিশেষ করে, ট্রেনের আগে স্থানীয় অগণিত দাবি পূরণের চাপ সৃষ্টি করার বিষয়টি নেতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। তারপরেও সূত্র বলছে, সবকিছু ঠিক থাকলে এ মাসের যে কোন সময় থেকে এই সার্ভিস চালুর আশা করা হচ্ছে। সে লক্ষ্যে এরইমধ্যে পাবনা স্টেশনকে সাজানো গোছানোর কাজও শেষ করে রাখা হয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

পরিবেশ বাঁচাও



ফুলের অভাব চলনবিলে

দেবশীষ নাগ দীপ্ত

বর্ষায় চলনবিল পানিতে ভরে উঠলেই গোলাপী পদ্ম, সাদা শাপলা আর নানা রকম পানির ফুলে ঢেকে যেতো বিশালাকার জলাভূমি। বিগত বছরগুলোতে জলজ ফুলের সমারোহে চোখ জুড়ালেও চলতি মৌসুমে একেবারেই ভিন্ন চিত্র। পর্যাপ্ত পানি না থাকায় এবং ফুল কম ফোটার কারণে চলনবিল দর্শনে এসে হতাশ হয়ে ফিরছেন পর্যটকরা।

পাবনার চাটমোহর উপজেলার ফৈলজানা ও পার্শ্বভাঙ্গা ইউনিয়নের ১৫টি গ্রাম জুড়ে বিস্তৃত ‘ডিকশির বিল’। পর্যটকদের কাছে এটি ‘পদ্ম বিল’ নামে বেশি পরিচিত। কিন্তু এবার সেখানে অন্যরকম দৃশ্য। পানির প্রবাহ আশানুরূপ না থাকায় বিলে স্বাভাবিক পানি জমেনি। ফলে ফুটে থাকা কয়েক গুচ্ছ ফুল আর ভেসে থাকা পাতা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না। অবশ্য ফুল কম থাকলেও সাপ্তাহিক ছুটির দিনসহ অন্যান্য দিনে হাজারো পর্যটকের আগমন ঘটছে। পাবনা শহরের ব্যবসায়ী সৈকত আসাদ জানান, প্রতি বছর সন্তানদের নিয়ে নৌকায় ঘুরে পদ্ম-শাপলা দেখার অভিজ্ঞতা থাকলেও এবারে দুইবার গিয়েও তার কন্যা একটি ফুলও ছুঁয়ে দেখতে পারেনি। একই অভিজ্ঞতার কথা জানান কাচারী পাড়ার বাসিন্দা রফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, বিলের গভীর অংশে কিছু ফুল থাকলেও এবার পুরো বিল জুড়ে শুধুই পাতা ভেসে আছে।

ডিকশির বিলের স্থানীয় মাঝি মো. শাহাদাত হোসেন বলেন, চলতি মৌসুমে বিলে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

নিষিদ্ধ ১০ নিত্যপণ্য

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় বাংলাদেশ মান (স্ট্যান্ডার্ড) অনুযায়ী নির্ধারিত মানদণ্ড পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় বাঘাবাড়ী ঘি, বম্বা সুইটসের মসলাসহ ১০টি নিত্যপণ্য নিষিদ্ধ করেছে মান প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)। অবিলম্বে বাজার থেকে এসব পণ্য প্রত্যাহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এসব পণ্যের জন্য দেয়া বিএসটিআইয়ের দেওয়া লাইসেন্স কেন বাতিল করা হবে না, সে বিষয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষায় নিম্নমানের প্রমাণিত হওয়ায় এসব পণ্য কেনা থেকে বিরত থাকতে ভোক্তাদের পরামর্শও দিয়েছে বিএসটিআই। গত ২৬ আগস্ট বিএসটিআইয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্প্রতি বিএসটিআই নিয়মিত পর্যবেক্ষণের অংশ হিসেবে বাজার থেকে বিভিন্ন কোম্পানির পণ্য সংগ্রহ করে আন্তর্জাতিক মানের নিজস্ব আত্যাধুনিক ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে। এ পরীক্ষায় বেশ কিছু পণ্যের মান সঠিক পাওয়া যায়। তবে কিছু ব্র্যান্ডের ঘি, বাটার অয়েল ও মসলার মান পরীক্ষায় নিম্নমানের পাওয়া যায়। ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় দেখা গেছে,

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

দুর্লভের দিকে পদ্মার ইলিশ

■ বিশেষ প্রতিবেদন



পদ্মায় অন্যান্য মাছের তুলনায় ইলিশ বেশি পাওয়া যেত বলে এক কালে নদী অববাহিকায় হালদার ও দাস উপাধিদারী মালো জাতীয় মৎস্যজীবীদের আবাস গড়ে উঠেছিল। বর্তমান আগের মতো ইলিশ মেলে না বলে জেলে সম্প্রদায় অন্যান্য পেশায় যুক্ত হয়ে পড়ছে। বদলে গেছে মাছের আড়ৎ। ইলিশ শিকারীদের পেশা বদলে গেছে। তারা হতাশ। মাছের বাজারে অন্যতম বৃহৎ যোগানদার হওয়া সত্ত্বেও জেলেরা সীমাহীন দরিদ্র এবং ক্রমবর্ধমান ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ছে অসহায়ভাবে। রূপালী ফসলের ঐতিহ্য ও উৎপাদনের মানচিত্রকে ধূসর করার জন্য অন্তর্ভুক্ত পরিস্থিতি অনেকাংশে দায়ী।

পাবনা জেলার দক্ষিণ সীমান্তে পদ্মা রয়েছে ৯০ কিলোমিটার জুড়ে। ঈশ্বরদী-পাবনা সদর ও সুজানগর উপজেলা অতিক্রম করে বেড়া উপজেলার নতিবপুরের দক্ষিণে যমুনা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে পদ্মা। এই ৪টি উপজেলার প্রায় ১৫টি পয়েন্টে ইলিশ বিক্রির আড়ৎ ছিল। জেলার ইতিহাস থেকে

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

Call for appointment
+880 1313 542211

CARE YOU CAN TRUST

Services we provide

- Dental Implants
- Root Canal Treatment
- Treatment of Oral Cancer
- Dental Extraction
- Tooth Colored Filling
- Scaling & Polishing
- Fixation of Jaw Fracture
- TM Joint Dysfunction

Why choose us?

- Highest Measure for Sterilization
- Modern State of Art Equipment
- Comprehensive Consultation & Treatment Plan
- Exact Costing Plan Before Even Starting the Procedure.

DR. MAUSUMI IQBAL
IN-HOUSE MAXILLOFACIAL SURGEON
BMDC reg no. 3395

DR. MEZBAH UL AZEEZ
IN-HOUSE PERIODONTOLOGIST
BMDC reg no. 3695

tooth care
লিথ কেয়ার

Address
14/1, Mirpur Road BTI Emporium
4th Floor Shyamoli, Dhaka
Bangladesh

Clinic hours
Saturday to Thursday
12:30 pm to 8:00 pm
(Closed on Fridays and Govt Holiday)

এস.বি ০০০/৬১